স্যারকে দেখাল। স্যার অবাক হয়ে পানির উষ্ণতা পরীক্ষা করতে করতে বললেন, গ্রামদেশে একটা কথা আছে, গ্রাম্য কথা, মূর্খ অশিক্ষিত কথা, পেটে গু থাকলে জিলিপি বানিয়ে ইয়ে করা যায়— এই আমেরিকার মানুষের পেটে গু আছে!

সরকার স্যার সময় নিয়ে গোসল করে একটা লুঙ্গি পরে বের হলেন। তাঁকে দেখে বেশ সজীব দেখাতে লাগল, ছোট একটা চিরুনি দিয়ে পাতলা হয়ে যাওয়া চুল সমান করতে করতে বললেন, জায়নামাজটা দে দেখি, নামাজটা পড়ে ফেলি।

তারিকের কোনো জায়নামাজ নেই, কখনো ছিলও না। মাথা চুলকে বলল, একটা পরিষ্কার টাওয়েল দিলে হবে না স্যার?

হবে। পশ্চিম কোন দিকে?

তারিক দেখিয়ে দিতে গিয়ে থেমে গেল, তার মনে পড়ল এখানে নামাজ পশ্চিম দিকে মুখ করে পড়ে না। বলল, স্যার, আপনাকে তো পূর্ব দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে হবে।

পূর্ব দিকে?

হ্যাঁ, মক্কার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার কথা। এখান থেকে মক্কা হচ্ছে পূর্ব দিকে। একটু দক্ষিণ ঘেঁষে।

সরকার স্যারের খানিকক্ষণ লাগল ব্যাপারটা বুঝতে। যখন বুঝলেন, তখন তিনি একেবারে ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে উঠলেন। মুখ উজ্জ্বল করে বললেন, কী তিলিসমাতি ব্যাপার! দুনিয়ার উল্টা দিকে চলে এসেছি!

সরকার স্যার নামাজ পড়তে শুরু করলেন। সুর করে সূরা পড়ছেন, বেশ লাগে শুনতে, কেন জানি ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়। তারিক এই ফাঁকে টেলিফোন করে পুলিশকে সন্ধেবেলার ব্যাপারটি জানিয়ে রাখল। পুলিশ ব্যাপারটা নিয়ে খুব একটা গা করল বলে মনে হল না। মনে হয় এ ধরনের ব্যাপার প্রায় রোজই ঘটছে, তবু পুলিশের লোকটি তারিককে খুশি করার জন্যে তার নাম-ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার টুকে রাখল।

খেতে বসে রান্নার আয়োজন দেখে স্যার চোখ কপালে তুলে বললেন, তুই রেঁধেছিস সবকিছু?

না হলে কে রাঁধবে স্যার? আমার কি আর বাবুর্চি আছে?

স্যার মুরগির গোশত প্লেটে নিয়ে বললেন, একী! এই মুরগি তো দেখি হাতির সাইজ!

জ্বি স্যার। হরমোন দিয়ে বড় করে রাখে। যারা খায় তারাও নাকি ধীরে ধীরে হাতির সাইজ হয়।

স্যার হা-হা করে হেসে বললেন, তাহলে খা, তুই খা বেশি করে।

তারিক স্যারের সঙ্গে খেতে বসে। একটু ভয়ে ভয়ে ছিল, পাছে স্যার জিজ্ঞেস করে বসেন এটা হালাল মুরগি কি না। সে সুপার মার্কেটের মুরগি কিনে আনে, হালাল

মুরগি খাওয়ার মতো রুচি বা ধর্মপ্রীতি কোনোটাই তার নেই।

সরকার স্যার মনে হল খুব তৃপ্তি করে খেলেন। তবে স্যারের খাওয়ার ভঙ্গিটি ভালো না, একটা গ্রাম্য ভাব আছে। ভাতের বড় লোকমা তৈরি করে মুখে দিয়ে শব্দ করে ভিতরে টেনে নেন, একটু পরপর আঙুলগুলি মুখে পুরে চেটে পরিষ্কার করে নেন। খাওয়ার শেষের দিকে শব্দ করে একটা ঢেকুর তুললেন এবং প্লেটে পানি ঢেলে হাত ধুয়ে ফেললেন।

খাবার টেবিলে বসে সরকার স্যারের সাথে তারিকের গণমুক্তি নিয়ে কথা হল। গ্রামের ছেলেদের পড়াশোনার নানারকম অসুবিধে। এত কষ্ট করে যেসব জিনিস শেখে, তার বেশির ভাগই নাকি বিশেষ কাজে আসে না। তা ছাড়া সবার পড়ার সময় নেই, উৎসাহ নেই। স্যার তাই গ্রামের ছেলেদের উপযোগী করে একটা সিলেবাস তৈরি করেছেন, সেখানে যার যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু পড়ে, যার উৎসাহ বেশি সে এখানে পড়া শেষ করে নিয়মিত স্কুলে যায়। সেই স্কুলের সময় দশটা-পাঁচটা নয়, যার যখন সময় হয় তখন। একজন সেখানে অন্যজনকে শেখায়। সেই স্কুলে পাঁচ বছরের বাচ্চাও আছে, আবার ষাট বছরের বুড়োও আছে। পৌরনীতি, সমাজনীতি শেখানোর আগে সেই স্কুলে প্রথমে শেখানো হয় স্বাস্থ্যবিধি। তারপর চাষপ্রণালী। গতবার বন্যার পর নাকি স্যারের গ্রামের একটি মানুষও ডাইরিয়ায় মারা যায় নি, ধানের ফলন নাকি অন্য দশ গ্রাম থেকে বেশি।

গ্রামের এইসব নানারকম কার্যকলাপের নাম দিয়েছেন গণমুক্তি। তার কথা বলতে বলতে স্যারের চোখ উৎসাহে জ্বলজ্বল করতে থাকে— মনে হয় বয়স কুড়ি বৎসর কমে গেছে।

গণমুক্তির কথা আশেপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন কোনো-এক এন. জি. ও.-র কর্মকর্তা স্যারের সাথে দেখা করতে এসেছিল, কীভাবে গণমুক্তির কাজকর্ম করা হয় দেখে গিয়েছিল। কিছু কিছু জিনিস তাদের খুব ভালো লেগেছে, আবার কিছু কিছু জিনিস তারা একেবারে পছন্দ করে নি। স্যারকে বলেছিল, যদি তিনি তাদের পরিকল্পনামাফিক কাজকর্ম করেন, তা হলে তারা টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করবে। স্যার রাজি হন নি, গণমুক্তির প্রথম উদ্দেশ্যই হচ্ছে কারো কোনো সাহায্য ছাড়া বড় হওয়া। টাকাপয়সা এলেই নাকি ঝামেলা শুরু হয়ে যায়।

সেই লোক ফিরে গিয়ে কী কথা বলেছে কে জানে, কিন্তু কয়দিন পরেই আমেরিকার এক কনফারেন্সে গিয়ে বক্তৃতা করার জন্যে অনুরোধ করে একটা রেজিস্ট্রি চিঠি এসে হাজির। স্যার রাজি হওয়ার পর তারাই ভিসা টিকেট সব কিছুর ব্যবস্থা করেছে। যেদিন স্যারের ফ্লাইট, সেদিন নাকি এয়ারপোর্টে গ্রাম থেকে প্রায় তিন শ' মানুষ এসে হাজির। একটু পরপর শ্লোগান—

সরকার স্যার কই যায়

আমেরিকা, আর কোথায়?

ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে গ্রামের মানুষের স্বল্পবুদ্ধি নিয়ে বাড়াবাড়ি হতাশা প্রকাশ করলেও গলার স্বরে খুশিটুকু লুকিয়ে রাখতে পারলেন না।

কথা বলতে বলতে রাত প্রায় একটা বেজে গেল। তারিক ঘড়ি দেখে ব্যস্ত হয়ে বলল, স্যার, অনেক রাত হয়েছে। এখন শুয়ে পড়েন।

হ্যাঁ বাবা, শুয়ে পড়ি। গত চব্বিশ ঘন্টা দুই চোখের পাতা এক করতে পারি নাই। কোথায় শোব?

এই যে, বেডরুমের বিছানায়।

তোর বিছানায়? তুই কোথায় ঘুমাবি?

আমি সোফায় ঘুমাব।

সোফায়? স্যার চোখ কপালে তুলে বললেন, সোফায় আবার মানুষ ঘুমায় কেমন করে? এই তো বিছানাটা বড় আছে, দুই জনের আরামে জায়গা হয়ে যাবে, খামাখা সোফায় ঘুমাবি কেন?

তারিক বলল, স্যার, এই সোফাটা টানলে বিছানা হয়ে যায়।

সত্যি!

হ্যাঁ স্যার, এই দেখেন। তারিক তার হাইড-এ-বেডটি টেনে ভাঁজ করে থাকা অংশটি বের করে বড় বিছানা তৈরি করে ফেলল। দেখে সরকার স্যার চমৎকৃত হলেন, মাথা নেড়ে বললেন, বলেছিলাম না তোকে, এদের পেটে গু আছে! বলেছিলাম না?

শোওয়ার আগে তারিক সরকার স্যারকে জিজ্ঞেস করল, স্যার, ঘুমানোর আগে এক গ্লাস দুধ খাবেন স্যার?

দুধ? না রে বাবা, দুধ আর হজম করতে পারি না।

তা হলে অন্য কিছু? অরেঞ্জ জুস? আপেল জুস?

সেটা কী জিনিস?

ফলের রস। কমলার, না হয় আপেলের।

ফলের রসও পাওয়া যায়?

যায় স্যার।

টিপে টিপে রস বের করে বিক্রি করে?

যন্ত্রপাতি দিয়ে বের করে। খেয়ে দেখবেন এক গ্লাস?

দে দেখি। আপেলের রসটা দে দেখি।

তারিক বড় এক গ্লাস ভরে আপেল জুস নিয়ে এল। সরকার স্যার চমৎকৃত হয়ে তাকিয়ে রইলেন গ্লাসের দিকে। আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপেলটাকে টিপে রস বের করে?

মনে হয়।

রসটাকে টিপে বের করে তারপরে আপেলটাকে কী করে, ফেলে দেয়?

ফেলেই তো দেবে, না হয় কী করবে?

আপেলটা ফেলে দেয়! স্যার তখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না। রসটা রেখে

আপেলটাকে ফেলে দেয়?

তারেক মাথা চুলকে বলল, না হয় কী করবে?

দেশের কত মানুষ জীবনে কেউ একটা আপেল খেয়ে দেখে নি, আর এরা সেই আপেল ফেলে দেয়!

তারিক একটু অস্বস্তি বোধ করতে থাকে, এভাবে যে জিনিসটা দেখা যায়, সে কখনো চিন্তাও করে নি।

স্যার অনেকক্ষণ আপেল জুসটার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর গ্লাসটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, না রে বাবা, আমি এটা খেতে পারব না।

সরকার স্যার এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি খেয়ে শুয়ে পড়লেন।

৮

সরকার স্যার তারিকের সাথে দু' সপ্তাহ থাকলেন। এই দু' সপ্তাহ স্যারের পিছনে তারিককে বেশ খানিকটা সময় দিতে হল। বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া, দর্শনীয় জিনিস দেখানো, কনফারেন্সের সেমিনারটিকে মোটামুটি গুছিয়ে দেয়া— এ ধরনের ব্যাপার ছাড়াও প্রতিদিন রান্না করে স্যারকে খাওয়াতে হত। এক দিন রান্না করে কয়েক দিন খাওয়া যেতে পারে, এই ব্যাপারটিই স্যারকে বোঝানো গেল না, তাঁর ধারণা রেফ্রিজিরেটর জিনিসটি তৈরি হয়েছে হাড়কেপ্পন বড়লোক মানুষের জন্যে। স্যার অবশ্য অত্যন্ত উৎসাহী মানুষ। শেষের দিকে ছোটখাটো জিনিস রান্না করা শিখে গেলেন। তারিক কাজ থেকে ফিরে এসে দেখত, সরকার স্যার ভাত রান্না করে আলুভর্তা এবং ডাল রেঁধে ফেলেছেন! মাছ-মাংসজাতীয় জিনিসে হাত দিতে সাহস পেতেন না, তারিক এসে সেগুলি রান্না করত।

সেমিনার শেষ করে সরকার স্যার যখন তারিকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিউ অর্লিন্স চলে গেলেন, তারিকের বেশ মন-খারাপ হয়ে গেল। মোটামুটি ক্ষ্যাপাগোছের সহজ সরল মানুষটি তারিকের দৈনন্দিন রুটিনবাঁধা জীবনের বারটা বাজিয়ে দিয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু শেষের দিকে সে সারাদিন কাজকর্ম করে রাতে সরকার স্যারের সঙ্গটির জন্যে অপেক্ষা করা শুরু করেছিল। দেশের সাথে তার যোগাযোগ নেই বহুদিন, সরকার স্যার হঠাৎ করে যেন একটা জানালা খুলে দিয়ে গেলেন। সেই জানালা দিয়ে একেবারে সত্যিকারের দেশটি দেখা যায়— আমজাদ সাহেবের দেশের সাথে তার কোনো মিল নেই।

সরকার স্যার একা একা নিউ অর্লিন্স এবং তারপর নিউ ইয়র্কের মতো জায়গা হয়ে কীভাবে দেশে ফিরে যাবেন সেটা নিয়ে তারিকের প্রথম বেশ দুশ্চিন্তা ছিল। স্যারকে দেখে কয়েক দিনেই টের পেয়ে গেল তার দুশ্চিন্তা অমূলক। স্যার ভালো ইংরেজি বলতে পারেন, যদিও তাঁর ইংরেজি চল্লিশ বছর আগের পাঠ্যপুস্তকের ইংরেজি এবং উচ্চারণের কারণে তিনি কারো ইংরেজি বুঝতে পারেন না এবং অন্য কেউও তাঁর ইংরেজি বুঝতে পারে না। দু' সপ্তাহ তারিকের বাসায় থেকে সে অবস্থার অনেক উন্নতি

হয়েছে। তাঁর নিজের উচ্চারণ এখনো কেউ বুঝতে পারে না, কিন্তু অন্যদের কথা আজকাল তিনি বেশ বুঝতে পারেন। সবচেয়ে বড় কথা, পশ্চিমা দেশের রীতিনীতির মূল ব্যাপারটা ধরে ফেলেছেন, বিদেশ নিয়ে শ্বাসরুদ্ধকর আতঙ্কটা আর নেই। স্যারকে এয়ারপোর্টে প্লেনে তুলে দেবার আগে তারিককে বুকে জড়িয়ে ধরে যখন ভেউভেউ করে কাঁদতে শুরু করলেন—তখন তারিকের চোখেও পানি এসে গেল, হাসিকান্নাজাতীয় ব্যাপারগুলি মনে হয় সংক্রামক।

সরকার স্যারকে প্লেনে তুলে দিয়ে সোজাসুজি ল্যাবরেটরিতে চলে এল তারিক। গত দু' সপ্তাহ কাজকর্মে ঢিল পড়েছিল, এখন সামলে নিতে হবে। উঁচু চেয়ারে বসে মাকড়শার জালের মতো সূক্ষ্ম স্টেনলেস স্টীলের তারটি হাতে নিয়ে সে খানিকক্ষণ উপুড় করে রাখা বোর্ডটির দিকে তাকিয়ে থাকে। বোর্ডটিতে শ'খানেক লাইন দেয়া আছে, তার উপর দিয়ে এই স্টেনলেস স্টীলের তারগুলি বসাতে হবে, দু' পাশে টানটান করে ঝালাই করে দিতে হবে। স্টেনলেস স্টীল ঝালাই করা যায় না বলে তার জন্যে বিশেষ ফ্লাক্স আনা হয়েছে। জন বলছিল, এই ফ্লাক্স এবং র‍্যাটল স্নাপের বিষে বিশেষ পার্থক্য নেই, যেখানেই লাগবে সেই জায়গাটাই নাকি ঘা হয়ে খসে পড়ে যাবে। তার থেকে যে ধোঁয়া বের হয় সেটি নিঃশ্বাসের সাথে বুকের মাঝে গিয়ে ফুসফুসকে নাকি প্যাচপেচে জেলির মতো করে দেয় এবং কাশির সাথে তখন নাকি ফুসফুসের অংশবিশেষ বের হয়ে আসে। জনের বাড়িয়ে বলার অভ্যাস, তারিক তাই বেশি গা করে না, কিন্তু ফ্লাক্সটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত খারাপ জিনিস, বোতলের উপর একটি করোটির ছবি, এবং নিচে বড় বড় করে লেখা "সাবধান বিযাক্ত দ্রব্য"!

তারিক একটা কিউ টিপে খানিকটা ফ্লাক্স লাগিয়ে মাইক্রোস্কোপের নিচে স্টেনলেস স্টীলের তারটি বসানোর চেষ্টা করতে থাকে। ব্যাপারটি সহজ নয়, এই মাইক্রোস্কোপে সবকিছু উল্টো দেখা যায়, কাজেই যখন স্টেনলেসের তারটিকে বাম দিকে সরানোর কথা মাইক্রোস্কোপে সেটাকে ডান দিকে সরাতে হয়, ব্যাপারটি চেষ্টা করে কিছুক্ষণেই তারিকের প্রায় মাথা-খারাপের মতো হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত তারটিকে ঠিক জায়গায় রেখে কিউ টিপে ফ্লাক্স লাগানোর চেষ্টা করে। মাইক্রোস্কোপ থেকে চোখ না সরিয়ে এবারে হাতড়ে হাতড়ে সোল্ডারিং আয়রনটি এনে উত্তপ্ত টিপটি স্টেনলেস স্টীলের সূক্ষ্ম তারের উপর চেপে ধরে। সাথে সাথে বাষ্পীভূত ফ্লাক্সের ঝাঁঝালো ধোঁয়ায় ঘর ভরে যায়। তারিক কাশতে কাশতে কোনোমতে সরে আসে। এই ব্যাপারটির জন্যে এর থেকে ভালো কোনো পদ্ধতি থাকা দরকার।

তারিক এবারে মিনিট দশেক সময় ব্যয় করে প্রস্তুতি নেয়। দুটি ছোট ফ্যান ঝাঁঝালো ধোঁয়াকে সরিয়ে নেবে, জানালায় একটা বড় ফ্যান ঘরে বিশুদ্ধ বাতাস আনবে বাইরে থেকে। এবারে তারিক আবার মাকড়শার জালের মতো সূক্ষ্ম তারটিকে ঝালাই করার চেষ্টা করে। যে ছোট দুটি ফ্যান ঝাঁঝালো ধোঁয়াকে সরিয়ে নেবে, সেটা সোল্ডারিং আয়রনের টিপটিকে ঠাণ্ডা করে দিচ্ছে। নূতন একটা সোল্ডারিং আয়রন আনতে হল তারিকের, যেখানে টিপটির তাপমাত্রা ইচ্ছেমতো বাড়ানো কমানো যায়। সবকিছু ঠিক করে আবার সে ঝালাই করার চেষ্টা করে। ব্যাপারটি সহজ নয়, পাঁচ বারের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ঝালাই করা শেষ হয়। একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে যেই তার

মাথাটাকে সরানোর চেষ্টা করে, কনুইয়ের খোঁচা লেগে মাকড়শার জালের মতো সূক্ষ্ম তারটি পিং করে ছিঁড়ে গেল। তারিক মাথা ঝাঁকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, হারামজাদা শুওরের বাচ্চা, তোর চোদ্দ গুষ্টির আমি ইয়ে করি।

গালি খেয়েও সূক্ষ্ম স্টেনলেস স্টীলের তারটির কোনো ভাবান্তর হল না, তারিকের মেজাজ গরম করে দেবার জন্যে ফ্যানের বাতাসে নাচতে থাকল। খানিকক্ষণ বিষদৃষ্টিতে সেটার দিকে তাকিয়ে থেকে তারিক আবার গোড়া থেকে শুরু করে এবং আট মিনিটের মাথায় প্রথম তারটি ঠিক জায়গায় ঝালাই করে শেষ করতে পারে। এখনো এরকম শ'খানেক কাজ বাকি, চিন্তা করে তার পেটের মাঝে কেমন জানি পাক খেয়ে ওঠে। সব রিসার্চের মাঝেই কেমন জানি একটা নির্দয় ব্যাপার আছে, জিনিসটা সে আগেও অনেক বার লক্ষ করেছে।

দ্বিতীয় তারটি ঝালাই করা হল তের মিনিটের মাথায়। তৃতীয় তারটি আঠার মিনিটের মাথায়। পাঁচ মিনিটে একটা করে হলেও চোখ বুজে দশ ঘন্টা লেগে যাবে। দশ ঘন্টায় এই বিষাক্ত ঝাঁঝালো ধোঁয়া তার ফুসফুসের কী গতি করবে কে জানে। প্যাচপেচে জেলি হিসেবে কাশির সাথে ফুসফুস বের হয়ে আসছে চিন্তা করে তারিকের কেমন জানি গা গুলিয়ে আসতে থাকে।

সোল্ডারিং আয়রনটি সুইচ টিপে বন্ধ করে তারিক ঘর থেকে বের হয়ে আসে, তার খানিকটা বিরতি দরকার। লাইব্রেরিতে গিয়ে খবরের কাগজে চোখ বোলানো যায়, কমিক পৃষ্ঠাটি সে নিয়মিত পড়ে।

বাইরে চমৎকার রোদ উঠেছে। ঝকঝকে নীল আকাশ। লস এঞ্জেলসের শুকনো বাতাসে কেমন জানি একটা সতেজ ভাব, একবার নিঃশ্বাস নিলেই কেমন জানি মনটা ভালো হয়ে যায়। তারিক বুক ভরে কয়েকবার নিঃশ্বাস নিল।

লাইব্রেরির দরজায় তারিক একটা শাড়িপরা মেয়েকে দেখতে পেল। এখানে শাড়িপরা মেয়ে খুব কম। কিছু ভারতীয় মেয়ে আছে, কিন্তু সবাই শার্ট-প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়ায়। দক্ষিণ ভারতীয় একটি মেয়ে— যার স্বামী কুস্তিগীর, মাঝে মাঝে শাড়ি পরে, শ্রীলংকার একটি মেয়ে শুধু সবসময় শাড়ি পরে থাকে। তারিক একটু কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে যায়, মেয়েটি লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আর একটু দেরি হলেই মেয়েটি লিফটে উঠে আটতলা লাইব্রেরির কোনো এক তলায় হারিয়ে যেত, কিন্তু তারিককে দেখে মেয়েটি লিফটে না ঢুকে তার দিকে এগিয়ে আসে। মেয়েটি মিলি, আমজাদ সাহেবের শ্যালিকা।

লাইব্রেরিতে যত জোরে কথা বলা নিয়ম তারিক তার থেকে একটু বেশি জোরে বলল, আরে মিলি! তুমি এখানে?

মিলির মুখ কেমন জানি খুশিতে ঝলমল করে ওঠে, বলে, হ্যাঁ, আমি ভাবছিলাম, ইস, আপনার সাথে যদি দেখা হয়ে যেত। কী কপাল, সত্যি দেখা হয়ে গেল!

তারিক বলল, আমি তো আর ইউনিভার্সিটির ডীন না যে আমার সাথে অ্যাপয়ন্টমেন্ট করে দেখা করতে হবে! ফোন করলেই তো হত।

আসলে আমি জানতাম না যে আপনাদের লাইব্রেরিতে আসব। একটা রেফারেন্সের দরকার ছিল, একজন বলল এখানে আসতে। আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে শাটল বাস আসে, আমি জানতাম না।

হ্যাঁ, আমি জানি।

প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটা কেটে যাবার পর হঠাৎ করে দু'জনেরই কথা শেষ হয়ে গেল। কথা চালিয়ে যাবার জন্যে এর পর কী বলা যায় তারিক চিন্তা করতে থাকে। 'স্কুল কেমন লাগছে', 'এখনো কি দেশের জন্যে মন খারাপ লাগছে', 'আমজাদ ভাইয়ের কী খবর', 'ভাবী কেমন আছেন' এই ধরনের কিছু-একটা বলতে গিয়ে তারিক হঠাৎ করে থেমে গিয়ে একটা সাহসের কাজ করে ফেলল, বলল, এত সুন্দর দিনে কী রেফারেন্স ঘাঁটাঘাঁটি করবে? চল কোথাও থেকে ঘুরে আসি।

এক মুহূর্তের জন্যে মিলির মুখে বিস্ময়ের একটা ছায়া পড়ে। ভদ্রভাবে একটা অজুহাত দিতে গিয়েও সে থেমে যায়। মুখে হাসি টেনে বলে, ঠিক বলেছেন। রেফারেন্সের খেতা পুড়ি।

তারিক এর আগে কখনো কোনো মেয়েকে 'খেতা পুড়ি' বলতে শোনে নি। একটু অবাক হয়ে মিলির দিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে হা-হা করে হেসে ওঠে। লাইব্রেরির বেশ কিছু মানুষ ভুরু কুঁচকে তারিকের দিকে তাকাল, কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপ করল না।

লাইব্রেরি থেকে বের হতে হতে তারিক ভাবল, কী জঘন্যভাবে দিনটি শুরু হয়েছিল, কিন্তু কী চমৎকারভাবেই না সেটা পাল্টে গেল!

গাড়ি দক্ষিণে সাগরের দিকে ছুটে যাচ্ছে। সাগর নয়, মহাসাগর—প্রশান্ত মহাসাগর। আপাতত লস এঞ্জেলসের ফ্রী ওয়েতে মহাসাগরের কোনো চিহ্ন নেই। ছয়টি লেনে পাশাপাশি গাড়ি একটি আরেকটিকে প্রায় স্পর্শ করে সত্তর মাইল বেগে ছুটে চলছে। এত গাড়িতে করে এত মানুষ সব সময় কোথায় ছুটতে থাকে ব্যাপারটা তারিককে সব সময়েই অবাক করেছে। সে সাবধানে লেন পরিবর্তন করে বলল, ভালোই হল, আমরা তিমিমাছ দর্শনে যাচ্ছি।

মিলি জানালার কাঁচটি একটু নামিয়ে দিয়ে বলল, কেন?

আমি কখনো যাই নি, শুনেছি খুব মজার। সত্যিকার তিমিমাছ সমুদ্রে লাফঝাঁপ দিচ্ছে, বুঝতেই পার।

তারিক মিলিকে তিনটি জায়গার কথা বলেছিল, তার মাঝে সে এটা বেছে নিয়েছে। অন্য দুটি ছিল হান্টিংটন লাইব্রেরি ও লা ব্রিয়া টার পিট। হান্টিংটন লাইব্রেরি আসলে হান্টিংটন নামে এক সৌখিন ধনকুবেরের বসতবাড়ি, যে প্রথমে তার এক বিত্তশালী চাচীকে বিয়ে করে এবং পরে রেলগাড়ির ব্যবসা করে অনেক টাকা উপার্জন করেছিল। লা ব্রিয়া টার পিট শহরের মাঝামাঝি একটা জায়গা, যেখানে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীরা আলকাতরার মাঝে আটকা পড়ে মরে পড়ে আছে। তৃতীয়টি এই তিমিদর্শন, যেখানে একটা ছোট জাহাজে করে দর্শকদের প্রশান্ত মহাসাগরে নিয়ে যাওয়া হয়—

বছরের এই সময়ে আলাস্কা থেকে তিমিমাছের দল এই পথ দিয়ে মেক্সিকো যায়।

মিলি জিজ্ঞেস করল, তিমিমাছ ধাক্কা দিয়ে জাহাজটাকে উল্টে দেবে না তো?

তারিক শব্দ করে হাসল, দিলে আর কী করা যাবে! দেশে খবরের কাগজে খবর উঠে যাবে, তিমিমাছ দর্শন করিতে গিয়া বাঙালি তরুণ-তরুণীর শোচনীয় মৃত্যু। জোর পুলিশি তদন্ত চলিতেছে।

পুলিশি তদন্ত? পুলিশি তদন্ত কেন?

এমনি বললাম আর কি! শোচনীয় মৃত্যুর কথা বললেই কেন জানি পুলিশি তদন্ত এসে যায়।

সামনের গাড়িগুলি থেমে যাচ্ছে, তারিক ব্রেকে পা দিয়ে বলল, আমার কপাল! যখন যে-লেনে থাকি তখন সেই লেনের গাড়ি আর নড়তে চায় না! দেখ দেখি পাশের লেনের কী অবস্থা!

অনেকই তো ভিড় দেখি!

পিছনের গাড়িটা কে চালাচ্ছে? ছেলে না মেয়ে?

ছেলে।

কী রকম চেহারা? রাগী রাগী নাকি?

কেন?

কী মনে হয়, সামনে গেলে গুলি করে দেবে?

গুলি! মিলি অবাক হয়ে বলল, গুলি কেন করবে?

তারিক হাসতে হাসতে বলল, তুমি জান না, লস এঞ্জেলসের রাস্তায় হঠাৎ করে কারো সামনে গাড়ি নিয়ে গেলে লোকজন মেজাজ খারাপ করে গুলি করে দেয়?

সত্যি?

হ্যাঁ। চিন্তা কর, যদি গুলি খেয়ে যাই, খবরের কাগজে উঠে যাবে, লস এঞ্জেলসের ফ্রী ওয়েতে আততায়ীর গুলিতে বাঙালি তরুণ-তরুণীর শোচনীয় মৃত্যু। জোর পুলিশি তদন্ত চলিতেছে।

মিলি হেসে বলল, পুলিশি তদন্ত ছাড়া আপনার মাথায় মনে হয় আজ আর কিছু নেই।

একেক দিন একেকটা শব্দ মাথার মাঝে ঢুকে যায়। সারা দিন শব্দটা ঘুরঘুর করতে থাকে। তোমার হয় না?

আমার? মিলি একটু ভেবে বলল, শব্দ হয় না। কিন্তু মাঝে মাঝে গানের লাইন ঢুকে যায়। সারা দিন মাথায় একটা গানের লাইন খেলতে থাকে।

গানের লাইন? কী সুন্দর, বাহ্! তুমি গান গাইতে পার?

না, পারি না। কতদিন কোনো গানটানও শুনি না ছাই! দেশে থাকতে প্রতিদিন দুপুরবেলা শুয়ে শুয়ে গান শুনতাম।

গান শুনবে তুমি? আমার কাছে অনেক বাংলা ক্যাসেট। এই গাড়িতেও আছে। দাও লাগিয়ে দিই। তারিক হাতড়ে হাতড়ে একটা ক্যাসেট বের করে লাগিয়ে দিতেই শচীন দেবের আনুনাসিক গলা গাড়িতে গুঞ্জন করে ওঠে,

মন দিল না বধূ
মন নিল যে শুধু

আহা-হা— কী গলা! তারিক ভাবের আবেগে চোখ বন্ধ করতে গিয়ে থেমে যায়, অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে একটা গাড়ি তাকে পাশ কাটিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে।

কোথায় জানি পড়েছিলাম আমি, একেকটা গান একেকটা সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়।

তাই নাকি? মিলি একটু হেসে বলল, এই গানটা আপনাকে কোন সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়?

এই গানটা? তারিক একটু হেসে বলল, আমাকে কোনো সময়ের কথা মনে করায় না। কিন্তু জান?

কি? মিলির গলা হঠাৎ কেঁপে গেল, সে বুঝে যায় তারিক কি বলবে।

এর পর থেকে যখনই এই গানটা শুনব, আমার তোমার কথা মনে পড়বে।

মিলি কোনো কথা বলল না, সহজ হালকা একটা কথা বলার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে, কিছুতেই সেরকম একটা কথা মনে করতে পারল না। অকারণে তার গাল দুটি একটু লাল হয়ে গেল।

সমুদ্রতীরে সমুদ্রের আঁশটে গন্ধ। ঝকঝকে সুন্দর দিন, তাই অনেক মানুষের ভিড়। ছোট ছোট দোকানগুলি ঘিরে মানুষজন ঘোরাঘুরি করছে, চারিদিকে কেমন একটা উৎসবের ভাব। সমুদ্রতীরে কাঠের পাটাতন পাতা। লোকজন অলসভাবে হাঁটছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারিক মিলিকে বলল, কিছু-একটা খেয়ে নেয়া যাক, কি বল?

এখন?

হ্যাঁ। জাহাজটা ছাড়তে এখনো এক ঘন্টা। কী খাবে, বল।

কিছু খেতে পারি না আমি। যা গন্ধ সবকিছুতে।

এখনো খেতে পার না? কী মুশকিল! তারিক এদিক সেদিক তাকিয়ে বলল, এখানে মেক্সিকান খাবারের দোকান আছে। তুমি খেতে পারবে। বলব ঝাল করে তৈরি করে দিতে।

মেক্সিকান?

হ্যাঁ। খেয়েছ কখনো? টাকো? এনচিলাডা?

না।

তারিক উজ্জ্বল মুখে বলল, দারুণ খেতে!

খেতে গিয়ে দেখা গেল যত দারুণ ভাবা গিয়েছিল খাবার তত দারুণ নয়। সমুদ্রতটে শখের টুরিস্টের জন্যে খাবার দোকান— দোকানি খুব ভালো করে জানে, কেউ দ্বিতীয় বার ঘুরে এখানে খেতে আসবে না, তাই নেহায়েৎ জোড়াতালি দেয়া আয়োজন। খাবারে বাসি টকটক গন্ধ, তারিক নিজেই একরকম জোর করে খেল, মিলি একেবারেই সুবিধে করতে পারল না।

তারিক বেশ অপ্রস্তুত হয়ে বলল, আসলে মেক্সিকান খাবার এত খারাপ হয় না, অনেক মজার হয় খেতে। এখানে কী যে হল!

কেন, ভালোই তো!

কিছুই তো খেলে না!

আমি এরকমই খাই।

এত কম খেয়ে কি বেঁচে থাকতে পারে! মরে যাবে একদিন।

মেয়েরা সহজে মরে না। মিলি হেসে বলল, শোনেন নি আপনি, মেয়েদের জান বিড়ালের মতো শক্ত?

তারিক মুগ্ধ দৃষ্টিতে মিলির দিকে তাকিয়ে থাকে। গত কয়েক ঘন্টা তারা একসাথে, কিন্তু সারাক্ষণই ছিল পাশাপাশি। এই প্রথমবার তারা বসেছে মুখোমুখি। তারিক অবাক হয়ে মিলির চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকে, এত সুন্দর একজনের চেহারা কেমন করে হয়! কী সুন্দর শরীর! যেটুকু দেখা যাচ্ছে সেটুকু দেখতে কী কোমল আর মসৃণ! একবার স্পর্শ করার জন্যে তারিকের হাত নিশপিশ করতে থাকে।

মিলি বলল, কী হল আপনার?

তারিক থতমত খেয়ে যায়। প্রাণপণ চেষ্টা করে একটা বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলার জন্যে, মাথা নেড়ে তাড়াতাড়ি বলে, বিড়ালের সাথে মেয়েদের জানের তুলনা করার কোনো সায়েন্টিফিক বেসিস নেই। বিড়ালের জান শক্ত, তার কি প্রমাণ আছে? নেই।

মেয়েদের হেনস্থা করা নিয়ে কথা। এত সায়েন্টিফিক বেসিস খুঁজলে তো মুশকিল।

মিলির দিকে তাকিয়ে আবার সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কী সুন্দর দুটি ঠোঁট! লাল টুকটুকে কোনো একরকম ফলের মতো। ইচ্ছা করে দাঁত দিয়ে কুটুস করে একটা কামড় দিতে। কবি-সাহিত্যিকেরা কি খামোকা এই ঠোঁট নিয়ে দিস্তার পর দিস্তা কাব্য লিখে গেছে?

কী হল আপনার?

হ্যাঁ— তারিক দ্রুত কিছু-একটা বলার চেষ্টা করে, মেয়েদের হেনস্থার কথা বলছ, সেটা কি সত্যি? আমার তো মনে হয় আমাদের সোসাইটিতে আমরা মেয়েদের বেশ ভালো সম্মানই দিই।

মিলি আবার কী-একটা বলে, তারিক ঠিক শুনতে পেল না। মুগ্ধ হয়ে সে তার

দাঁতগুলি লক্ষ করে। এত সুন্দর কারো দাঁত হতে পারে? লাল ঠোঁটের পিছনে সাদা দাঁতগুলি দেখতে কী সুন্দরই না লাগছে!

কি হল? চুপ মেরে গেলেন যে?

এবারে তারিক আর বুদ্ধিদীপ্ত কিছু বলায় চেষ্টা করল না। বেশ সহজভাবে বলে ফেলল, মিলি, আসলে আমি সব সময় গুছিয়ে কথা বলতে পারি না।

কেন?

মানে ইয়ে— মনে হয় স্কুল কলেজে মেয়েদের সাথে বেশি মেশার সময় পাই নি, তাই মেয়েদের সাথে কথা বলতে গেলে কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়। বিশেষ করে তোমার সাথে— তোমার চেহারা এত ভালো যে প্রত্যেকবার তোমার দিকে দেখছি আর— তারিক থতমত খেয়ে থেমে গিয়ে বলল, তুমি কিছু মনে করলে না তো, প্লীজ?

মিলি একটু অবাক হয়ে তাকাল তারিকের দিকে। মনে হল চোখে এক ধরনের বিষণ্ণতা এসে ভর করেছে। তারিক একটু ব্যস্ত হয়ে বলল, প্লীজ, তুমি কিছু মনে করো না। আমি মানে—ইয়ে—

মিলির চেহারায় কেমন জানি একটা দুঃখের ছায়া পড়ে। আস্তে আস্তে বলে, তারিক ভাই, আপনাকে একটা কথা বলি।

তারিক শঙ্কিতভাবে বলল, কী কথা?

মিলি একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তারিকের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, না, থাক।

থাকবে কেন, বল।

নাহ্, কিছু না।

বল। কী হল?

অন্য কখনো বলব।

ঠিক আছে।

দু' জন চুপচাপ বসে থাকে। এত সুন্দর একটা পরিবেশ এভাবে নষ্ট করার জন্যে তারিকের নিজেকে জুতা মারার ইচ্ছে করতে থাকে। মেয়েদের চেহারা ভালো বললে মেয়েরা খুশি হয় বলে শুনেছিল। গাধার মতো সেটা চেষ্টা করে কী বেকুবই না সাজল মেয়েটার সামনে! তারিক কেমন জানি একটা সূক্ষ্ম অপমান অনুভব করে। আস্তে আস্তে বলল, মিলি।

কী হল?

তুমি কি— তুমি কি ফিরে যেতে চাও?

ফিরে যাব?

হ্যাঁ। আমি তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসতে পারি।

মিলি খুব অবাক হল,বলল, কেন? আপনি তিমিমাছ দেখতে চান না?

আমি তো চাই। কিন্তু তুমি—মানে—ইয়ে—

কী হল আপনার? এত কষ্ট করে এলাম—

হঠাৎ করে তারিকের মনটা আবার ভালো হয়ে যায়। কী চমৎকার মেয়েটি! আহা, একটিবার যদি মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারত!

খাবারের দাম দিল মিলি। জাহাজের টিকিটও কাটল মিলি। আজ নাকি সে তার জীবনের প্রথম নিজের উপার্জনের টাকা পেয়েছে। কিছু–একটা খরচ করে দেখতে চায়, অন্তত সেটাই তারিককে বুঝিয়েছে। তারিক খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বুঝতে পেরেছে মিলি সত্যিই তাই চায়, ভদ্রতা করার চেষ্টা করছে না। তারিক আর আপত্তি করল না, বরং ব্যাপারটাতে একটা মেয়েসুলভ কোমলতার চিহ্ন খুঁজে পেতে শুরু করে।

তিমিমাছ দেখতে যাওয়ার জন্যে তারা যে–জাহাজের জন্যে অপেক্ষা করছিল, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল সেটি ছোট নড়বড়ে একটা লঞ্চ। তিমিমাছ দেখার জন্যে সেই নড়বড়ে লঞ্চেই অনেক মানুষ গাদাগাদি করে উঠেছে এবং লঞ্চটি ঠিক সময়মতো বিকট গর্জন করে সমুদ্রের দিকে রওনা দিল। মোহনাটি পার হয়ে বড় একটা বাতিঘর পাশ কাটিয়ে মূল সমুদ্রে হাজির হওয়ামাত্র বড় বড় ঢেউয়ে ছোট লঞ্চটি কাগজের নৌকার মতো দুলতে থাকে। ব্যাপারটি সম্ভবত খুব আনন্দের, কারণ কয়েকজন ছোট ছোট বাচ্চাকে অত্যন্ত উল্লসিত দেখা গেল। কিন্তু যাদের অভ্যেস নেই এবং যারা দুলুনি সহ্য করতে পারে না, তাদের জন্যে এর থেকে ভয়ংকর আর কিছু হতে পারে না। মিলিকে প্রথমে একটু বিভ্রান্ত দেখা গেল, তারপর প্রায় হঠাৎ করেই তারিককে দু' হাতে জাপটে ধরে একটু আগে খেয়ে আসা মেক্সিকান খাবার হড়হড় করে বমি করে দিল। নিচে একজনের মাথা বাঁচিয়ে সেই খাবার সমুদ্রের পানিতে পড়ে মেক্সিকোর দিকে দক্ষিণে ভেসে যেতে থাকে। সেই দিকে তাকিয়ে মিলি ফ্যাকাসে মুখে ফিসফিস করে বলল, আমি মনে হয় মরে যাব।

তারিক কী করবে বুঝতে পারল না। মিলি তাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে। তার দেহ অনেক কোমল হতে পারে, কিন্তু তার আঙুল নিঃসন্দেহে শক্ত এবং সেখানে বেশ জোর। বড় আরেকটা ঢেউয়ে লঞ্চটি দুলে উঠতেই তারিক মিলিকে জড়িয়ে ধরে বলল, মিলি! তুমি মরবে না।

মিলি ফ্যাকাসে মুখে আবার বলল, আমি মরে যাচ্ছি। তারপর সারা শরীর কাঁপিয়ে দ্বিতীয় বার বমি করার চেষ্টা করল। আশেপাশে যারা ছিল তারা ছিটকে সরে গেল, মিলি বিকট শব্দ করে বমি করার চেষ্টা করল, কিন্তু পেটে যা ছিল প্রথম বারেই বের হয়ে এসেছে, এবারে বিশেষ কিছু বের হল না।

কালো রংয়ের সহৃদয়গোছের একজন মানুষ এগিয়ে এসে তারিককে জিজ্ঞেস করল, তোমার স্ত্রী প্রেগনেন্ট?

তারিক প্রবলবেগে মাথা নাড়ল, না না, আমার স্ত্রী না।

লোকটি দাঁত বের করে হেসে বলল, গার্লফ্রেন্ড?

তারিক কথা না শোনার ভান করে। লোকটি তবু পিছনে লেগে থাকে, প্রেগনেন্ট,

নাকি সী সিক?

সী সিক।

ও! লোকটি সবকিছু বুঝে ফেলার মতো একটা ভঙ্গি করে বলল, দূরে তাকাতে বল। দূরে—অনেক দূরে। সী সিক হলে কাছে তাকাতে হয় না। সবসময় দূরে তাকাতে হয়। কানের মাঝে একটা তরল থাকে, সেটা দিয়ে ব্যালেন্স হয়, দুলুনিতে সেটা নষ্ট হয়ে যায়।

বিনি পয়সায় উপদেশ এবং জ্ঞানদান করেও লোকটি চলে গেল না, বেশ কাছে মুখে একটা স্মিত হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দেখে মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটিতে সে বেশ আনন্দ পাচ্ছে।

মিলি ঘোলাটে চোখে তারিকের দিকে তাকিয়ে বলল, বাথরুমটা কোথায়?

কালো মানুষটি হাত দিয়ে দেখায়, এই তো এখানে। সোজা সামনে গিয়ে ডান দিকে। ডান দিকে মেয়েদের বাথরুম। বাম দিকে ছেলেদের। পরিষ্কার বাথরুম। তাড়াতাড়ি যাও, একটু পর ময়লা হয়ে যাবে। এত মানুষ, মাত্র একটা বাথরুম। যাও যাও, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে যাও তাড়াতাড়ি। সরি, স্ত্রী তো না, গার্লফ্রেন্ড। গার্লফ্রেন্ড!

তারিক মিলিকে ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে যায়।

সমুদ্রের গভীরে গিয়ে যখন সত্যি সত্যি একপাল তিমিমাছের সন্ধান পাওয়া গেল, লঞ্চের লোকজনের আনন্দের আর সীমা রইল না। ক্যামেরায় ছবির পর ছবি উঠতে থাকে, ভিডিও ক্যামেরা চোখে লোকজন ছোটাছুটি করতে থাকে। তিমিমাছগুলি বিকট শব্দ করে মাথার ফুটো দিয়ে ফোয়ারার মতো পানি ছড়িয়ে দিচ্ছিল, দেখে তাক লেগে যায়। তারিক মিলিকে বাথরুমে ডাকাডাকি করে এল, কিন্তু মিলি বের হল না। তিমিমাছ দূরে থাকুক, স্বয়ং বিধাতা নেমে এলেও মিলির দেখার কোনো কৌতূহল হত বলে মনে হয় না। তারিক বাথরুমের সামনে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে, সমুদ্রের নীল পানিতে বিশাল তিমিমাছগুলি শিশুদের মতো খেলছিল, অপূর্ব একটি দৃশ্য, কিন্তু তারিক সেটি একেবারেই উপভোগ করতে পারছিল না।

মিলি সম্ভবত বাথরুম থেকে বের হত না, কিন্তু লঞ্চের আরো কিছু মহিলা সী সিক হয়ে গেল, একটি মোটে বাথরুম, কাজেই মিলিকে বের হয়ে আসতে হল। কিছুক্ষণের মাঝেই তার চেহারা পাল্টে গেছে, লাল চোখ, চোখের নিচে কালি, শুকনো ঠোঁট এবং কেমন যেন ভীত চেহারা, দেখে তারিকের বুকের ভিতর মোচড় খেতে থাকে। মিলিকে মনে হচ্ছিল দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, তারিক তাকে শক্ত করে ধরে বলল, তুমি ভালোয় ভালোয় ফিরে যাও, আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, জীবনে আর কখনো তোমাকে কোথাও নিয়ে যাবার চেষ্টা করব না। আমি এই বুক ছুঁয়ে বলছি।

মিলি দুর্বলভাবে একটু হাসার চেষ্টা করল। খুব লাভ হল না। লঞ্চের রেলিং ধরে কোনোভাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করতে লাগল।

ঘন্টা দুয়েক পর সমুদ্রের তীরে কাঠের একটা বেঞ্চে দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে মিলি একটা ভেজা রুমাল দিয়ে নিজের মুখ মুছে বলল, আমাকে নিশ্চয়ই এখন ভূতের মতো দেখাচ্ছে?

তারিক বলল, তোমাকে কেমন লাগছে সেটা নিয়ে তুমি এখন মাথা ঘামিও না—

তার মানে ভূতের মতো লাগছে?

না, তোমাকে মোটেও ভূতের মতো লাগছে না।

পেত্নীর মতো লাগছে?

তারিক হেসে বলল, হ্যাঁ, সেটা ঠিক বলেছ, খানিকটা পেত্নী পেত্নী ভাব এসে গেছে। কিন্তু তোমার কেমন লাগছে? একটু ভালো লাগছে?

না।

তোমার কি এখনো মনে হচ্ছে মরে যাবে?

না, তা মনে হচ্ছে না।

তা হলে নিশ্চয়ই ভালো লাগছে। ওঠ, একটু হাঁট, কিছু-একটা খাও, দেখবে ভালো লাগবে।

খাব? মিলি মুখ কুঁচকে বলল, মা গো, ছিঃ!

একটু চা কফি, একটু আইসক্রীম?

না, না, না— মিলি জোরে জোরে মাথা নাড়ে। আমি সামনে পুরো এক বছর কোনো খাওয়াখাওয়ির মাঝে নেই। একটু পর মুখ তুলে বলল, ইস! কী লজ্জা, আপনার সামনে বমি করে দিলাম!

লজ্জার কী আছে? শরীর খারাপ লেগেছে, বমি করেছ।

ছিঃ! তাই বলে সবার সামনে? মা গো, ছিঃ! আপনি কাউকে বলবেন না তো?

কাকে বলব আমি? তারিক কোমল স্বরে বলল, তোমাকে দেখে আমার এত কষ্ট হচ্ছিল, কী বলব! আমি যদি জানতাম, কখনই তোমাকে আমি এখানে নিয়ে আসতাম না। নেভার এভার।

আপনি কেমন করে জানবেন? আমিই জানি না।

চল, ওঠ। একটু হাঁটাহাঁটি কর। ভালো লাগবে।

মিলি উঠে দাঁড়াল, শাড়িটা একটু ঠিক করে নিয়ে বলল, আশেপাশে কোনো বাথরুম আছে? হাত-মুখটা একটু ধুয়ে নিতাম।

হ্যাঁ। চল নিয়ে যাই।

বাথরুম থেকে যখন মিলি বের হয়ে এল, তখন তার ঝকঝকে সতেজ চেহারা— গত কয়েক ঘন্টার সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কোনো ছাপ নেই। নিশ্চয়ই চুল ঠিক করেছে,

ঠোঁটে লিপস্টিক লাগিয়েছে, কপালে বাঁকা হয়ে থাকা টিপটা ঠিক জায়গায় বসিয়েছে, মুখে পাউডারের প্রলেপ দিয়েছে। তারিক দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল।

সমুদ্রতীরের জায়গাটা একটা মেলার মতো। চারপাশে নানারকম খেলার আয়োজন, ফেরিওয়ালা ঘুরছে, ছোট ছোট দোকানে মজার মজার জিনিসপত্র, খেলনা, খাবারদাবার। লোকজন হাটাহাঁটি করছে, কেনাকাটা করছে। এক পাশে গিটার বাজিয়ে গান গাইছে একজন বেসুরো গলায়, সামনে খোলা হ্যাটে পয়সা দিচ্ছে মানুষজন। ছবি আঁকছে একজন— পাঁচ ডলার দিলেই চেহারা ফুটিয়ে দেবে সাদা কাগজে। বেলুন নিয়ে যাচ্ছে একজন, মনে হচ্ছে হিলিয়াম বেলুন বুঝি উড়িয়ে নেবে এক্ষুণি। সস্তা দোকানে রংচংয়ে প্লাস্টিকের খেলনার পাশাপাশি অর্ধনগ্ন মেয়েদের ছবি, অশ্লীল কিছু জিনিসপত্র মোটামুটি প্রকাশ্যে ছড়িয়েছিটিয়ে রাখা, অন্য সময় হলে চোখ বুলিয়ে যেত, আজকে না দেখার ভান করে পাশ কাটিয়ে গেল। এক পাশে নাগরদোলা ঘুরছে, ছোট বাচ্চাদের লম্বা লাইন। একজন স্বর্ণকেশী মহিলা তাস দেখে ভাগ্য বলে দিচ্ছে নামমাত্র মূল্যে। স্বল্প পোশাকে ঘোরাঘুরি করছে কিছু বিশালবক্ষা তরুণী এবং পেশীসর্বস্ব তরুণ। হাওয়াই মিঠাই বিক্রি করছে একজন। দেয়ালে হেলান দিয়ে প্যাকেটে ঢেকে রাখা বোতল থেকে মদ খাচ্ছে কিছু নেশাগ্রস্ত মানুষ। গুমগুম শব্দে ভিডিও গেম খেলা হচ্ছে এক পাশে, ছটফটে কিশোরেরা সমস্ত একাগ্রতা দিয়ে খেলছে ভিডিও গেম।

উৎসবের আনন্দ চারদিকে। প্রথমে তারিক আর মিলি সেই উৎসবে বাইরের মানুষ হিসেবে ঘুরে বেড়াল খানিকক্ষণ। কিছুক্ষণের মাঝে দেখা গেল তারাও সেই উৎসবে যোগ দিয়েছে। রবারের কিছু ব্যঙকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পানিতে ফেলার একটা অত্যন্ত ছেলেমানুষি খেলায় মিলি খুব উৎসাহী হয়ে পড়ল। তারিক দীর্ঘ সময় চেষ্টা করেও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে কিছু খেলনা-ভোঁদড়কে গর্ত থেকে মাথা বের করা থেকে বিরত করতে পারল না। রোখ চেপে যাওয়ায় অনেকগুলি পয়সা বের হয়ে গেল তারিকের পকেট থেকে। দু' জনে মিলে ভিডিও গেমে বেশ কিছুক্ষণ শত্রু মহাকাশযান ধ্বংস করল গুলি করে। মিলি রেড ইন্ডিয়ান এক মহিলার কাছ থেকে নীল পাথরের এক জোড়া কানের দুল কিনল, তারিক কিনল দেখতে প্রায় সত্যি মনে হয় সেরকম রবারের একটা র‍্যাটল সাপ।

মিলির শরীর নিশ্চয়ই ভালো লাগতে শুরু করেছে। কারণ তারিক যখন আইসক্রীম খাবার কথা বলল, এবারে সে আর আপত্তি করল না। দু' জনে বেঞ্চে বসে আইসক্রীম খেল। বিশাল আইসক্রীম, খেয়ে শেষ করা যায় না। শেষ পর্যন্ত যখন শেষ করল, তখন দু' জনেরই শীত শীত করতে থাকে। মিলির ঠিক তখন মনে হল, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, এখন ফিরে যেতে হবে।

তারিক ঘড়ি দেখে বলল, খুব মজা হল আজকে, কি বল?

হ্যাঁ। সত্যি খুব মজা হল।

তোমার যদি সী সিকনেসটা না হত—

ও আচ্ছা, তাই তো! আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। ইস, কী লজ্জা! সবার সামনে ওয়াক ওয়াক করে বমি! ছিঃ!

তোমাদের এটা ভারি আশ্চর্য। নিজের কষ্ট হচ্ছে সেটা কিছু নয়, কিন্তু অন্যেরা কী ভাবছে সেটা চিন্তা করে ঘুম নেই।

থাক থাক, আপনাকে আর লেকচার দিতে হবে না। আপনি যেদিন কারো ঘাড়ে বমি করে দেবেন, তখন জিজ্ঞেস করব।

তুমি কি ভেবেছ আমি কখনো করি নি?

মিলি উৎসাহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, করেছেন? কবে?

তারিক মুখে রহস্যের ভান করে বলল, সেটা বলা যাবে না।

কেন?

ভারি লজ্জার ব্যাপার।

তা হলে? দোষ খালি আমার?

তারিক মাথা নাড়ে। আমার তখন তোমার জন্যে এত মায়া লাগছিল, কী বলব! মনে হচ্ছিল, ইস, কিছু যদি করতে পারতাম!

কী করতে চাচ্ছিলেন?

গিয়ে বোটের ক্যাপ্টেনের চুলের ঝুঁটি ধরে বলতাম, শালা, তোমার তিমিমাছের খেতা পুড়ি। এই মুহূর্তে ফিরে চল—

মিলি হি-হি করে হাসতে হাসতে প্রায় মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। কিছুতেই আর হাসি থামাতে পারে না। চোখে পানি এসে গেল হাসতে হাসতে।

মিলিকে দেখতে দেখতে তারিকের বুকের ভিতর সবকিছু যেন নড়েচড়ে যেতে থাকে। আহা! এই অসম্ভব সুন্দর কোমল মেয়েটিকে কি সে পেতে পারে না কোনোভাবে?

গাড়ি করে ফিরে আসার সময় আবার শচীন দেব খুব দরদ দিয়ে গাইলেন মন দিল না বধূ ......। মিলি খুব বিষণ্ন মুখে বসে রইল গাড়িতে। কয়েক বার কী-একটা বলতে চাইল তারিককে, কিন্তু বলতে পারল না।

তারিক বিছানায় আধশোয়া হয়ে পাশের টেবিল থেকে কিছু বইপত্র টেনে নেয়। মনের ভিতরে তার কেমন জানি হালকা একটা আনন্দ। ঘুরেফিরে মিলির কথা মনে পড়ছে তার। প্রেম ব্যাপারটি কি এভাবেই শুরু হয়?

তারিক হাতের বইপত্রগুলির দিকে তাকায়। অনেকদিন থেকে ভাবছে সে ভালো কিছু পড়বে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, বিশ্বসভ্যতায় প্রযুক্তির স্থান, মায়া ও ইনকা সভ্যতা বা এই ধরনের গুরুগম্ভীর কিছু। কিছু বইপত্র কিনেও রেখেছে সে। কিন্তু প্রতিদিন ঘুমানোর সময় সে ঘুরেফিরে হালকা কিছু ম্যাগাজিন নিয়ে বসে। কম্পিউটারের ক্যাটালগ, ফটোগ্রাফির কিছু ম্যাগাজিন ঘাটাঘাটি করে। নূতন কী বের হচ্ছে, কত দাম, কোথায় পাওয়া যায় এইসব দেখে তার বেশ সময় কেটে যায়। আজকেও তাই করছে, ঠিক সে-সময় হঠাৎ টেলিফোন বাজল। তারিক ঘড়ির দিকে

তাকায়, রাত সাড়ে দশটা বাজে, তার জন্যে এটা বেশি রাত নয়। তবে সাধারণত এরকম সময়ে ফোন আসে না। বিছানায় শুয়েই সে ফোন ধরল, হ্যালো।

তারিক ভাই, আমি মিলি।

মিলি! তারিকের মুখ এক শ' ওয়াট বাল্বের মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, কী খবর তোমার, মিলি?

না, মানে ইয়ে আপনাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম।

কী জিনিস?

আপনি কি শুয়ে পড়েছেন?

না না, শুই নি।

সত্যি বলছেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তারিক হেসে বলে, ঘুমাতে ঘুমাতে আমার বারটা বেজে যায়। কী জিজ্ঞেস করবে?

আমি জানি না আপনি জানেন কি না।

সম্ভবত জানি না, আমি খুব বেশি জিনিস জানি না। তবু তুমি জিজ্ঞেস করতে পার। কী?

ইয়ে— মিলি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে একসময় প্রায় মরিয়া হয়ে বলে, আমার পরিচিত একটা ছেলে আছে ঢাকায়। আমাদের সাথে পড়ত বায়োকেমিস্ট্রিতে। পড়াশোনাতে সেরকম ভালো না। সে যদি আমেরিকা আসতে চায়, তার কি কোনো উপায় আছে?

তারিক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তোমার পরিচিত ছেলে?

মিলি মৃদু স্বরে বলল, হ্যাঁ।

তারিক আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তুমি আজ দুপুরে আমাকে এটা বলতে চেয়েছিলে?

মিলি একটু ইতস্তত করে বলল, হ্যাঁ।

তারিক অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমি আসলে জানি না কীভাবে আসা যায়। তা ছাড়া— তারিক একটু থেমে বলল, তুমি তো সত্যিই আমার কাছে জানতে চাইছ না ছেলেটা কীভাবে আসবে, তুমি আসলে আমাকে জানাতে চাইছ যে, ঢাকায় তোমার একজন পরিচিত ছেলে আছে। একজন—একজন ভালবাসার ছেলে—

মিলি কোনো উত্তর দিল না। তারিক আস্তে আস্তে বলল, মিলি—

মিলি খুব আস্তে আস্তে, প্রায় শোনা যায় না স্বরে বলল, হ্যাঁ।

থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মিলি। তারিক জোর করে একটু হাসির মতো শব্দ করে বলল, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।

মিলি কোনো উত্তর দিল না। দু' জন দু' পাশে টেলিফোন ধরে বসে রইল, কিন্তু ঠিক কী বলবে বুঝতে পারল না। কীভাবে কথা শেষ করে টেলিফোন রাখবে সেটা নিয়েও একটু সমস্যা হল। শেষ পর্যন্ত কিছু-একটা বলে মিলি টেলিফোনটা রাখার পরও তারিক অন্যমনস্কভাবে টেলিফোনটা কানে ধরে রাখে। হঠাৎ করে তার মনে হতে থাকে বুকের ভিতর যেন খানিকটা ফাঁকা হয়ে গেছে। মনে হতে থাকে কেউ যেন খানিকটা অংশ ধারালো চাকু দিয়ে কেটে নিয়ে গেছে।

দীর্ঘসময় সে হাঁটু ভাঁজ করে বিছানায় বসে রইল। সবকিছু কেমন যেন অর্থহীন মনে হচ্ছে। অন্যমনস্কভাবে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ায়। খানিকক্ষণ আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। কিছু-একটা করতে হবে তার। ধীরে ধীরে সে কাপড় পরে, টেবিল থেকে গাড়ির চাবি আর মানিব্যাগ নিয়ে অন্যমনস্কভাবে ঘর থকে বের হয়ে যায়।

গাড়ি স্টার্ট করে সে দীর্ঘসময় স্টিয়ারিং হুইল ধরে বসে থাকে। কোথায় যাবে এখন? ফরিদের মতো লাল বাতির ভিতর দিয়ে চালাবে? না, সেটা একটু বেশি নাটকীয় হয়ে যায়। কোনো বারে বসে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যাবে? দেবদাসের মতো? তারিকের হাসি পেল একটু। সে বারে গিয়ে কখনো মদ খায় নি, কেমন করে খেতে হয় জানে না। মদের নাম ধরে কি বলতে হয় যে অমুক মদটা এক গ্লাস দাও? নাকি বললেই হয় এক গ্লাস হুইস্কি? যদি জিজ্ঞেস করে কোন হুইস্কি, তাহলে কী বলবে? দি স্কারলেট সানের নায়ক যে-হুইস্কি খেয়েছিল সেই হুইস্কি?

তারিক গাড়ি নিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। ছোট ছোট রাস্তা গলি হয়ে বড় রাস্তা ফ্রী ওয়ে হয়ে আবার ছোট রাস্তায়। ঘুরেফিরে একসময় সে নিজেকে আবিষ্কার করে তার ল্যাবরেটরির সামনে।

রাত সাড়ে এগারটার সময় তারিক বোর্ডের উপর ঝুঁকে মাকড়শার জালের মতো সূক্ষ্ম স্টেনলেস স্টীলের তার ঝালাই করা শুরু করে। যখন তার কাজ শেষ হয়, তখন ঘড়িতে সাড়ে চারটা বাজে, বাইরে অন্ধকার হালকা হয়ে আসতে শুরু করেছে।

৯

জামাল বিছানায় আধশোয়া হয়ে টেলিভিশন দেখছে। ঠিক দেখছে নয়, চোখ বোলাচ্ছে। তার হাতে রিমোট কন্ট্রোল, একটা চ্যানেল খানিকক্ষণ দেখে পাল্টে অন্য চ্যানেলে চলে যাচ্ছে। এইচ. বি. ও. চ্যানেলে একটি অশ্লীল দৃশ্য দেখানো হচ্ছে। রাত গভীর হলে সিনেমার চ্যানেলগুলিতে এরকম রগরগে দৃশ্য দেখানো হয়। জামাল কয়েক মুহূর্ত দেখে চ্যানেল পাল্টে ফেলল। এই মুহূর্তে মানব-মানবীর ভালবাসার দৃশ্য দেখতে ভালো লাগছে না। তার বুকের উপর নগ্নদেহে শুয়ে আছে লিজা। চোখ বন্ধ, মুখ অল্প খুলে রেখেছে। ঠোঁটের লিপস্টিক সারা মুখে মাখামাখি হয়ে আছে। লিজা ঘুমের মাঝেই এক হাত দিয়ে জামালকে শক্ত করে ধরে রেখেছে। যেন হাত একটু আলগা করলেই সে হাতছাড়া হয়ে যাবে। জামাল লিজার অসম্ভব সুন্দর দেহটি একবার দেখে চোখ

সরিয়ে নেয়। ভালবাসাবাসির পর সব সময়েই সে নারীদেহের উপর এক ধরনের বিতৃষ্ণা অনুভব করে।

গভীর রাত্রিতে বুকের উপর নগ্ন একটি মেয়েকে শুইয়ে রেখে টেলিভিশনে অর্থহীন কোনো অনুষ্ঠান দেখার ব্যাপারটিতে কেমন জানি একটা দুঃখ-দুঃখ ভাব আছে। ঠিক কোন অংশটি দুঃখের সে ধরতে পারছে না। জামাল বিছানায় হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে। সে কি এরকম একটা জীবন চেয়েছিল?

সে নাকি অসম্ভব সুদর্শন। সুদর্শন কথাটি কোথাও ভালো করে ব্যাখ্যা করা নেই। জামাল অসংখ্যবার নিজেকে আয়নায় খুটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে, তাকে তার সুদর্শন মনে হয় নি। তার নাক, মুখ গ্রীক দেবতার ধাঁচে তৈরি হয় নি, তার গায়ের রং স্বচ্ছ মার্বেলের মতো নয়, তার চোখে নীল অতলান্ত সমুদ্রের গভীরতা নেই, বরং তার চেহারায় কেমন এক ধরনের পশু পশু ভাব। কিন্তু নিশ্চয়ই তার চেহারায় কিছু–একটা আছে, যেটা মেয়েদের বুকে আগুন ধরিয়ে দেয়। তা যদি না হত, তা হলে কেন যখন তার বয়স চোদ্দ বছর, তখন কুড়ি বছরের স্বাতী আপা তাকে জড়িয়ে ধরে ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়েছিলেন? স্বাতী আপা এখন বিয়ে করে সংসারী হয়েছেন, তিন মেয়ের মা, স্বামী বেচারার মাথায় বিস্তৃত টাক। কোনোদিন যদি দেখা হয় আর সে যদি বলে, স্বাতী আপা, মনে আছে একদিন আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘরের বাতি নিভিয়েছিলেন? মনে আছে?

জামাল ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। কত অল্প বয়সেই না সে আবিষ্কার করেছিল সে এবং তার দেহ দু'টি ভিন্ন জিনিস!

এদেশে এসে তার কত মেয়ের সাথে পরিচয় হয়েছে? ঘনিষ্ঠতা হয়েছে? হিসেব রাখতে পারে না সে। কতবার হয়েছে, মেয়েটিকে ঘরে এনে তুলেছে, ভালবাসাবাসি করে চলে গিয়েছে—নাম জিজ্ঞেস করা হয় নি। তার শরীর এবং তার মন, ধীরে ধীরে দু'টির ভিতরে যেন দূরত্ব শুধু বেড়েই চলেছে! দু'টি যেন ভিন্ন অস্তিত্ব, কারো সাথে কারো কোনো যোগাযোগ নেই।

বুকের মাঝে শুয়ে থেকে লিজা চোখ খুলে তাকাল জামালের দিকে, মুখটি উপরে তুলে চুমু খেল একবার জামালকে, তারপর আবার চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ল। মেয়েটির আশ্চর্য নিষ্পাপ একটি চেহারা, কিন্তু তাকে দেখে জামাল কেমন জানি একটি বিতৃষ্ণা অনুভব করতে থাকে।

কতদিন থাকবে লিজা তার সাথে? এক সপ্তাহ? দু' সপ্তাহ? এক মাস? তার বেশি নয়। কোনো মেয়েকে কি সে এক মাসের বেশি রেখেছে নিজের সাথে? মনে হয় না।

টেলিফোন বেজে উঠল হঠাৎ। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না এখন। কয়েক বার বেজে থেমে যাবে নিশ্চয়ই। জামাল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে। সত্যি কয়েক বার বেজে থেমে গেল, তারপর প্রায় সাথে সাথেই আবার বাজতে শুরু করল।

জামাল হাত বাড়িয়ে টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বলে, হ্যালো।

এটা কি জামাল আমেদের বাসা? একটি মেয়ের গলা। জামাল শব্দটি ঠিক করেই উচ্চারণ করেছে, কিন্তু আহমেদ কথাটিকে বলেছে আমেদ। কখনই এরা আহমেদ কথাটি ঠিক করে উচ্চারণ করতে পারে না।

জামাল বলল, হ্যাঁ।

আমি কি জামাল আমেদের সাথে কথা বলতে পারি?

কথা বলছি।

তোমার ঘরে কি আর কেউ আছে?

কেন?

আমি তোমার সাথে একা কথা বলতে চাই।

জামাল লিজার দিকে এক নজর তাকাল। মেয়েটি ঘুমিয়েই আছে, ঘরে থাকা না-থাকায় এখন আর কিছু আসে যায় না। বলল, আমি একাই আছি।

তুমি কি দাঁড়িয়ে আছ?

কেন?

আমি চাই তুমি কোথাও বস।

আমি বসেই আছি।

বেশ। মেয়েটি এক মুহূর্ত থেমে থেকে বলল, আমি তোমা'ক এখন এমন একটি কথা বলব, যেটা তোমার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জামালের হঠাৎ করে কেমন জানি ভয় লাগতে থাকে। ঢোক গিলে বলল, তুমি কে কথা বলছ, কোথা থেকে বলছ?

আমি সানফ্রানসিস্কো সংক্রামক ব্যাধি দপ্তর থেকে কথা বলছি। আমার নাম ক্যারল রডরিগাস। আমাদের সেন্টারে একটি মেয়ে এসেছে, তার নাম সিনথিয়া অ্যাডামস। তার শরীরে এইচ. আই. ভি. ভাইরাস ছিল, এখন সেটা পরিপূর্ণ এইডস হিসেবে দেখা দিয়েছে।

তুমি আমাকে কেন সেটা বলছ?

সেই মেয়েটির যাদের সাথে দৈহিক সম্পর্ক ছিল, আমরা তাদের সবার সাথে যোগাযোগ করছি। সিনথিয়া অন্য অনেকের সাথে আমাদেরকে তোমার নামও বলেছে। তোমার কি এই মেয়েটির সাথে শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল?

সিনথিয়া অ্যাডামস! জামালের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে। লালচুলের ক্ষ্যাপাগোছের মেয়েটি। ভালবাসাবাসির চরম মুহূর্তে যে সবসময় তাকে ধরে আঁচড়ে কামড়ে শেষ করে দিত।

হয়েছিল সম্পর্ক তোমার সাথে?

জামাল শুষ্ক স্বরে বলল, হ্যাঁ, সিনথিয়া আমার সাথে এক সপ্তাহ ছিল।

তোমার তারিখটি মনে আছে?

ডিসেম্বর মাসের দিকে। একটা ক্রিসমাস পার্টিতে পরিচয় হয়েছিল।

ততদিনে সে এইচ. আই. ভি. ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গেছে। মেয়েটি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, মিস্টার জামাল, আমরা চাই তুমি অবিলম্বে তোমার রক্ত পরীক্ষা করিয়ে দেখ সেখানে এইচ. আই. ভি. ভাইরাস আছে কি না।

জামাল কয়েক বার চেষ্টা করে বলল, আমার—আমার—আমার—এইডস—

না না না, তোমার এইডস হয়েছে সেটা আমি কখনো বলি নি। তোমার রক্তে এইচ. আই. ভি. ভাইরাস আছে, সেটাও আমি বলি নি। আমি বলেছি, তোমার এমন একটি মেয়ের সাথে শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল, যার শরীরে এইচ. আই. ভি. ভাইরাস। আমরা চাই তুমি তোমার রক্ত পরীক্ষা করে দেখ, কারণ এটি সংক্রামক ব্যাধি।

আমার—আমার—এইচ. আই. ভি.—

না, তোমার দেহে এইচ. আই. ভি. ভাইরাস—সেটার কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু যদি থাকে, তা হলে তোমার জীবনধারা পরিবর্তন করতে হবে। কারণ তখন তুমি অন্যদের আক্রান্ত করতে পার। কাজেই আমরা চাই তুমি অবিলম্বে তোমার রক্ত পরীক্ষা করাও। তোমার গোপনীয়তা রক্ষা করে তুমি কীভাবে সেটি করতে পার আমরা তোমাকে বলে দিতে পারি। আমি তোমাকে কয়েকটা টেলিফোন নাম্বার বলে দিই........

মেয়েটি শান্ত স্বরে কথা বলতে থাকে, কিন্তু জামাল কিছুই আর বুঝতে পারছে না, তার মাথায় সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে। অন্যপাশে টেলিফোন রেখে দেবার পরও দীর্ঘ সময় জামাল টেলিফোনটা কানে ধরে মূর্তির মতো বসে থাকে।

জামাল ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নেমে আসে, বড় আয়নায় নিজের উলঙ্গ দেহটিকে একটা কুৎসিত পশুর দেহের মতো মনে হয়। এই দেহের রক্তধারায় গোপনে বাসা বেঁধেছে এইচ. আই. ভি. ভাইরাস? জামাল প্রচণ্ড আতঙ্কে থরথর করে কাঁপতে থাকে। আচ্ছন্নের মতো কয়েক পা হেঁটে মেঝে থেকে প্যান্টটা তুলে পরে নয়ে, তারপর বসার ঘরে সোফায় বসে দুই হাতে নিজের মাথা ধরে রাখে। হায় খোদা, তুমি কী করলে এটা!

জামাল কতক্ষণ এভাবে বসে ছিল জানে না, হঠাৎ লিজার গলা শুনে ঘুরে তাকায়।

জামাল। সোনা, কী হয়েছে তোমার? এখানে এভাবে বসে আছ কেন?

জামাল কিছু না বলে হতচকিতের মতো লিজার দিকে তাকিয়ে রইল। লিজা জামালের একটা ড্রেসিং গাউন পরে বের হয়ে এসেছে, কোমরে ফিতাটি বাঁধতে বাঁধতে এগিয়ে এসে আবার জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে তোমার?

জামাল কিছু বলল না। লিজা এগিয়ে আসে, জামালের মুখকে স্পর্শ করে বলল, কী হয়েছে জামাল?

জামাল রূঢ়ভাবে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। লিজা আহত স্বরে বলল, জামাল, কী হয়েছে তোমার?

কিছু হয় নি। যাও তুমি।

নিশ্চয়ই কিছু-একটা হয়েছে, বল আমাকে। প্লীজ।

হঠাৎ করে জামাল চিৎকার করে বলল, আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও তুমি। দূর হও।

লিজার মুখের মাঝে কেউ যেন এক পোঁচ কালি লেপে দিল মুহূর্তে। ভয়ার্ত মুখে ছুটে এসে জামালকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বলল, জামাল! কী হয়েছে তোমার? জামাল, তুমি এরকম করছ কেন?

প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে জামাল লিজাকে মেঝেতে ফেলে দিল। ধাক্কা খেয়ে ঝনঝন করে টেবিল থেকে গড়িয়ে পড়ল কয়েকটা কাঁচের গ্লাস। অন্ধ আক্রোশে জামাল চিৎকার করে বলল, হারামজাদি বেশ্যা মাগী, আমার শরীর ছাড়া আর কী চাস তুই? কী চাস? কী চাস আমার কাছে?

উন্মত্ত আক্রোশে ঘুরে একটা লাথি মারে দেওয়ালে। জানালায় মাথা ঠুকে চিৎকার করতে করতে ঘুরে টেবিলে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে। ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙার শব্দ হয়, ভাঙা কাঁচে হাত কেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে আসে, সাদা কার্পেট ছোপ ছোপ রক্তে লাল হয়ে যায় মুহূর্তে।

ভয়ংকর আতঙ্কে জামাল স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রক্তধারার দিকে, এই রক্তের মাঝে কিলবিল করছে এইচ. আই. ভি. ভাইরাস?

১০

তারিকের চোখ বুজে আসছিল, হঠাৎ করে মাথার মাঝে সমাধানটা উঁকি দিয়ে যায়। সাথে সাথে লাফিয়ে উঠে বসে পড়ল সে। যে-সমস্যাটা সমাধান করার জন্যে সে এবং তার দলের সবাই গত তিন মাস থেকে চিন্তা করছে, তার সমাধানটা পেয়ে গেছে সে। এক্সপেরিমেন্টটার গোড়ায় একটা রিং বসাতে হবে, তার সাথে জুড়ে দিতে হবে একটা প্রি-এমপ্লিফায়ার। ব্যস! আর কিছু লাগবে না। বড় কম্পিউটারের প্রয়োজন নেই, অফ লাইনে ডাটা অ্যানালাইসিস নেই, জটিল ইলেকট্রনিক্স নেই—নিখুঁত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি সমাধান। তারিক বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ায়। আর কেউ তাকে ঠেকাতে পারবে না। ফিজিক্যাল রিভিউতে দু'টি পেপার চলে যাবে চোখ বুজে।

তারিক কাগজে পুরোটা এঁকে দেখে। ছোট একটা হিসেব কষে নেয় নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে। প্রি-এমপ্লিফায়ারটার খসড়া ডিজাইন করে খুব খুশি হয়ে মাথা নাড়তে থাকে। কাউকে বলার ইচ্ছে করছে তার, কিন্তু কাকে বলা যায়? প্রফেসর বিলকে ডেকে তুলবে? বুড়ো মানুষ। হার্ট অ্যাটাক হবার পর থেকে স্বাস্থ্যের দিকে খুব নজর দিয়েছে। এতক্ষণে শুয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই। ইঞ্জিনিয়ার বিল? সে আরো সকাল সকাল শুয়ে পড়ে। ল্যাবেটরিতে ফোন করে দেখলে হয়, কেউ আছে কি না। তারিক ফোন করল, ফোন ধরল শ্যারন।

শ্যারন, এত রাতে তুমি কী করছ?

আন্দাজ কর তো কী করছি?

ভালো না খারাপ?

ভালো? শ্যারন হাসার ভঙ্গি করে বলল, ভালো আবার কেমন করে হবে এই ল্যাবরেটরিতে!

তাহলে খারাপ?

হ্যাঁ।

কত খারাপ?

অনেক খারাপ।

গ্যাসটা দূষিত হয়ে গেছে?

শ্যারন এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, কেমন করে বুঝলে?

আমি বুঝি। এই যন্ত্রের প্রত্যেকটা স্ক্রুকে আমি চিনি। আমার হাতে তৈরি তো, আমার মতোই এটা মহাবদমাইস যন্ত্র! যাই হোক, খামোকা রাত জেগে কী করবে, কাল সকালেই পরিষ্কার করো।

না, কোনো সমস্যা নেই। হোম-ওয়ার্ক ছিল কয়েকটা, বসে বসে করতে করতে চোখ রাখছি। তুমি ফোন করেছ কেন?

তারিক একগাল হেসে বলল, একটা দারুণ আইডিয়া এসেছে মাথায়। একেবারে যাকে বলে সুপার আইডিয়া!

কি আইডিয়া? কাল ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারছ না—

কাল ভোরে সানডিয়াগো যাচ্ছি আমি।

ও আচ্ছা। এ. পি. এস.-এরমীটিং?

হ্যাঁ। আসতে আসতে বৃহস্পতিবার হয়ে যাবে। ভাবলাম যাবার আগে বলে যাই।

কি আইডিয়া, শুনি।

তারিক মধ্যরাত্রিতে টেলিফোনে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে শুরু করে। শ্যারন খুব উৎসাহ নিয়ে শোনে।

সানডিয়াগো থেকে তিন দিন পর তারিক ফিরে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। কনফারেন্সে একটু ভদ্রভাবে থাকতে হয়।

টাই না পরলেও একটা কোট পরে থাকা ভদ্রতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শুধু তাই নয়, নানা দেশের নানা বিজ্ঞানীরা আসে। তাদের কথাবার্তা আলোচনা একসময় পদার্থবিজ্ঞানে এত সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে যে, হালকা অর্থহীন কথাবার্তার জন্যে প্রাণ আইঢাই করতে থাকে। নিজের ল্যাবরেটরিতে বিবর্ণ জিনস এবং রংচংয়ে টী শার্ট পরে হাজির হয়ে তারিকের সত্যি খুব আরাম হল। প্রথমে দেখা হল জনের সাথে, বলল, কেমন হল কনফারেন্স?

ভালো।

কোনো বড় আবিষ্কারের ঘোষণা হয়েছে?

আবিষ্কার কি আর ডালভাত?

তা ঠিক। তোমার টক কেমন হয়েছে?

একরকম। এখানে কী খবর?

শ্যারন একটা দারুণ জিনিস বের করেছে।

কি জিনিস?

জন চোখ বড় বড় করে বলল, তোমার এক্সপেরিমেন্টে। একটামাত্র রিং আর প্রি-এমপ্লিফায়ার দিয়ে সব ব্যাকগ্রাউন্ড ঝেঁটিয়ে দূর করে ফেলে দেয়া হবে। দারুণ একটা আইডিয়া—

শ্যারন দিয়েছে আইডিয়াটা?

হ্যাঁ। সোমবার গ্রুপ মীটিংয়ে। জন গলা নামিয়ে বলল, মেয়েছেলের উপর ধারণাটা পাল্টে গেল। আগে ভাবতাম খালি বিছানাতেই ভালো, এখন দেখি মাথাতেও মালপানি আছে। হা হা হা।

তারিক ভ্রূ কুঁচকে জনের দিকে তাকাল, শ্যারন দিয়েছে এই আইডিয়াটা?

হ্যাঁ! প্রফেসর বিল মহা খুশি। রাত্রে পার্টি আছে তাঁর বাসায়।

এই আইডিয়ার জন্যে?

হ্যাঁ।

তারিক মোটামুটি হতবুদ্ধি হয়ে নিজের অফিসের দিকে রওনা দিল। মাঝপথে ইঞ্জিনিয়ার রিচার্ডের সাথে দেখা। একটা অতিকায় সার্কিট বোর্ড বগলে নিয়ে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে। তারিককে দেখে থেমে জিজ্ঞেস করল, কেমন হল কনফারেন্স?

ভালো।

তোমার টক?

ভালোই। তোমার বগলে এটা কি?

ভিটো রিং। তুমি ছিলে না, গত সোমবার গ্রুপ মীটিংয়ে শ্যারন দারুণ একটা আইডিয়া দিয়েছে। একটা রিং তৈরি করে পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটা বের করা। সেটাই তৈরি করছি।

তৈরি হয়ে গেছে?

মোটামুটি। ডিজাইন কমপ্লিট। ওয়ার্কশপে নিয়ে যাচ্ছি, প্রোটোটাইপটা বানাব।

ও!

তারিক নিজের অফিসে ঢুকে খানিকক্ষণ চুপ করে নিজের চেয়ারে বসে রইল। এরকম ব্যাপারও ঘটে! দেখতে শুনতে কত চমৎকার একটা মেয়ে, অথচ কত বড় ধড়িবাজ! এই মেয়েটিকে কি চুলের ঝুঁটি ধরে রাস্তার মোড়ে একটা আছাড় দেয়া দরকার না? সে ভেবেছে এরকম একটা বদমাইসি করে পার পেয়ে যাবে? তারিক যদি

এক্ষুণি গিয়ে প্রফেসর বিলকে সত্যি কথাটা বলে, তাহলে কি এক্ষুণি এই মাকাল ফলকে কানে ধরে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে না? তারিকের নাক-মুখ দিয়ে প্রায় আগুন বের হতে শুরু করল।

তারিক উঠে দাঁড়াল, কাউকে কিছু বলার আগে শ্যারনকে খুঁজে বের করতে হবে। প্রথমে প্রফেসর বিলের অফিসে গেল, সেখানে নেই। বিল হাত তুলে বললেন, মেজর ব্রেক থ্রু হয়েছে, শুনেছ?

শুনেছি।

ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া! কি বল?

ঠিক।

তারিক শ্যারনকে খুঁজতে থাকে। ল্যাবরেটরিতে নেই, নিজের অফিসেও নেই। দুপুরে লাঞ্চের সময় দেখা পাওয়া গেল, কিন্তু তারিককে দেখে সুট করে সরে পড়ল। বিকেলে সেমিনারে শ্যারন পিছন দিকে বসে রইল, শুধু তাই নয়, সেমিনার শেষ হবার আগেই পা টিপে টিপে নিঃশব্দে হাওয়া হয়ে গেল। তারিক দাঁত কিড়মিড় করে বলল, তোমার রংবাজি আমি যদি না ছুটাই!

বিকেল বেলা তারিক পা টিপে টিপে শ্যারনের অফিসে এসে দেখে, শ্যারন টেবিলে মাথা নিচু করে কী যেন লিখছে। তারিক দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই শ্যারন ভীষণ চমকে ওঠে। তারিককে দেখে মুখটা মুহূর্তে একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে যায়। তারিক শক্ত গলায় বলল, তোমার সাথে কয়েকটা কথা বলতে চাই শ্যারন, তোমার সময় হবে একটু?

শ্যারন দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল, হবে।

দরজাটা বন্ধ করে দিই? শ্যারন কিছু বলার আগেই তারিক দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিল। তারপর ভয়ের ছবিতে খুনীরা যেভাবে অসহায় মেয়েদের খুন করার জন্যে এগিয়ে আসে, তারিক অনেকটা সেভাবে শ্যারনের দিকে এগিয়ে যায়। তারিকের নিজেকে মনে হতে থাকে কোনো হিন্দি ছবির ভিলেন। শ্যারনের টেবিলে দুই হাত রেখে মাথা নিচু করে বলল, সবাই বলছে আমাদের এক্সপেরিমেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ড দূর করার সাংঘাতিক একটা ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া দিয়েছ তুমি? সুপার আইডিয়া!

শ্যারন মাথা নাড়ল।

অসম্ভব ভালো আইডিয়া। সত্যি?

শ্যারন আবার মাথা নাড়ল।

আইডিয়াটা কার?

শ্যারন দুর্বল গলায় বলল, তোমার।

তারিক হকচকিয়ে গেল। শ্যারন এত সহজে স্বীকার করবে সে কল্পনাও করে নি। কদর্য, জঘন্য, নির্মম একটা বাকবিতণ্ডার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছে সে। তারিক

একটা ঢোক গিলে বলল, তা হলে সবাইকে তুমি কেন বলেছ এটা তোমার আইডিয়া?

আমি কখনো বলতে চাই নি এটা আমার নিজের আইডিয়া। গ্রুপ মীটিংয়ে আমি যখন তোমার ভিটো রিংয়ের কথাটা বলেছি, সবাই সেটা নিয়ে এত হৈচৈ শুরু করে দিল যে, আমি আর কথা বলার সুযোগই পেলাম না। সবাই ধরে নিল এটা আমি ভেবে বের করেছি। এখন—

শ্যারনের মুখটা এত দুঃখী দুঃখী হয়ে গেল যে তারিকের মায়া হতে থাকে।

তুমি ইচ্ছে করে এটা কর নি?

না। সেটা কি কেউ করতে পারে? তোমার কি মনে হয় আমি এত বড় প্রতারক?

না, তা হয় না!

আজকে প্রফেসর বিল ইয়ংয়ের বাসায় আমি বলে দেব।

কি বলবে?

বলব যে এটা তোমার আইডিয়া, আমার নয়। সবাই থাকবে, সবার সামনে বলে দেব। তোমাকে কথা দিচ্ছি। শ্যারন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, ছিঃ ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জা! কী লজ্জা! আমি কেমন করে এটা করলাম? শ্যারন ঠোঁট কামড়ে বসে থাকে। তারিকের ভুলও হতে পারে, কিন্তু মনে হয় তার চোখে পানি টলটল করছে।

তারিক সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ে, এই জটিল পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করতে থাকে। মাথা নেড়ে বলে, শ্যারন, তুমি একেবারে গাধার মতো একটা কাজ করেছ। এটা খুব বোকার মতো একটা কাজ হল।

আমি জানি।

জিনিসটা এমনভাবে গড়িয়েছে যে, এখন যদি তুমি সত্যি কথাটি বল তুমি খুব একটা বাজে অবস্থার মাঝে পড়বে। খুব একটা লজ্জার পরিস্থিতি।

জানি। কিন্তু দোষটা আমার, আমাকেই সামলাতে হবে। শ্যারন তারিকের দিকে তাকিয়ে দুর্বলভাবে একটু হাসার চেষ্টা করল।

আমার মনে হয়—

কি?

আমার মনে হয় তোমার বলার প্রয়োজন নেই যে, আইডিয়াটা আমার।

শ্যারন অবাক হয়ে তারিকের দিকে তাকাল, মনে হল ঠিক বুঝতে পারছে না তারিক কী বলছে।

তারিক আবার বলল, সবাই যখন মনে করছে এটা তোমার আইডিয়া, ব্যাপারটা সেভাবেই থাকুক।

শ্যারন খানিকক্ষণ লজ্জা, অপমান, অপরাধবোধের সাথে সাথে স্বস্তি আর কৃতজ্ঞতাবোধের একটা বিচিত্র দৃষ্টিতে তারিকের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করল। তারিক দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু মনে হচ্ছে মেয়েটার চোখে পানি এসে যাচ্ছে।

তারিক হালকা স্বরে বলল, তোমার ব্যস্ত হবার কিছু নেই, এরপর যখন তোমার মাথা থেকে খুব ভালো একটা আইডিয়া বের হবে, সেটা আমি নিজের নামে চালিয়ে নেব।

প্রফেসর বিলের বাসায় সবাই এসেছে। তাঁর স্ত্রী বারবারা—হাসিখুশি ধরনের মহিলা, দৌড়াদৌড়ি করে খাবারের আয়োজন করছেন। বাসাটি অপূর্ব সুন্দর—চারদিকে গাছগাছালি, পিছনে সুইমিং পুলে নীল পানি টলটল করছে। দূরে সেন্ট গ্যাব্রিয়েল পাহাড়ের সারি। টেবিলে কাজুবাদাম এবং নানারকম পানীয় রাখা আছে। যারা মদ্যপান করে না, তাদের জন্যে আপেল সাইডারজাতীয় হালকা পানীয়। প্রফেসরের স্ত্রী বারবারার একটা কুকুর বড় একটা খেলনা কুকুরের মতো লাফঝাঁপ দিচ্ছে। কুকুরটির নাম নেপোলিয়ান, সবাই আদর করে ন্যাপি বলে ডাকছে।

গল্পগুজব করে সবাই গ্লাসে করে কিছু-না-কিছু চাখছে। মদ্যপানের কারণেই কি না বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু পরিবেশ খুব তরল। শ্যারন খুব সেজেগুজে এসেছে, দেখে চোখ ফেরানো যায় না। তার ভাবভঙ্গি খুব সহজ, কথায় কথায় হাসিতে ভেঙে পড়ছে। প্রত্যেক বার তারিকের দিকে চোখ পড়তেই অত্যন্ত মিটমিট করে অর্থপূর্ণভাবে হাসছে। সেই হাসিতে অনেকখানি কৃতজ্ঞতা, কিন্তু দেখে কেন জানি তারিকের গা জ্বলে উঠতে থাকে। শ্যারনকে কেমন জানি বেশ্যা-বেশ্যা মনে হতে থাকে।

দীর্ঘ সময় নিয়ে সবাই বসে খাওয়া হল। খাওয়ার আয়োজন বেশি নয়, তবে পরিমিত। এদের খাওয়ার ধরনটি তারিকের খুব পছন্দ। বিন্দুমাত্র অপব্যয় নেই, বিন্দুমাত্র বাহুল্য নেই। মনে হয় খাবার তৈরি করা থেকে খাবার পরিবেশন করার যত্ন নেয়া হয় বেশি। কী সুন্দর থালাবাসন, কী সুন্দর কাঁটা চাকু, কী সুন্দর ন্যাপকিন, কী সুন্দর পেয়ালা-পিরিচ! ওক কাঠের বিস্তৃত ডাইনিং টেবিলে কী সুন্দর করে সব কিছু সাজানো! খুব শখ করে খেল সবাই।

খাবারের শেষ পর্যায়ে হঠাৎ প্রফেসর বিলের স্ত্রী বারবারা বললেন, ন্যাপিকে দেখছি না কেন? ন্যাপি?

প্রফেসর বিল বললেন, আছে নিশ্চয়ই কোথাও।

আমার আশেপাশেই তো থাকে সবসময়। বারবারা উচ্চস্বরে ডাকলেন, ন্যাপি—ন্যাপিসোনা—

খেলনা পুতুলের মতো ছুটতে ছুটতে আসার কথা ছিল। কিন্তু সেটি ছুটে এল না। বারবারা উদ্বিগ্ন মুখে উঠে এলেন, এদিকে সেদিকে খুঁজলেন, উচ্চস্বরে ডাকাডাকি করলেন, কিন্তু ন্যাপির কোনো খোঁজ নেই। যাদের খাওয়া শেষ হয়েছে তারাও উঠে এল। ঘরের ভিতরে খুঁজে না পেয়ে সবাই বাইরে বের হয়ে এল। অন্ধকার হয়ে এসেছে, বাইরে আলো নেই, টর্চলাইট হাতে সবাই বাগানে খুঁজতে থাকে। কিন্তু কোথাও ন্যাপির দেখা নেই। বারবারা প্রায় ভেঙে পড়েছেন, ভাঙা গলায় বারবার বলছেন, ন্যাপি, আমার আদরের ন্যাপি—

হঠাৎ সুইমিং পুলের কাছে থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল, ওটা কী? ওটা কী?

সবাই ছুটে এল, সুইমিং পুলের মাঝামাঝি বলের মতো কী যেন একটা ভাসছে। টর্চলাইটের আলোতে দেখা গেল—ন্যাপি। পানিতে ভিজে চুপসে আছে। প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই, নিশ্চল হয়ে ভাসছে।

সুইমিং পুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে তুলে আনা হল। পানি খেয়ে ঢোল হয়ে আছে, বারকতক ঝাঁকুনি দেয়া হল, তখন দুর্বলভাবে চোখ খুলে একটা খিঁচুনি দিল ন্যাপি।

বেঁচে আছে! বেঁচে আছে! বেঁচে আছে এখনো—বারবারা চিৎকার করে বললেন, হাসপাতালে চল, হাসপাতালে—

ন্যাপিকে একটা টাওয়েলে জড়িয়ে প্রফেসর বিল তখন তখনি হাসপাতালে ছুটলেন। তাঁদের বাসার কাছেই নাকি একটা পশু হাসপাতাল আছে। তারিক জানালায় দাঁড়িয়ে দেখল, প্রফেসর বিল এবং তাঁর স্ত্রী বারবারা ন্যাপিকে বুকে জড়িয়ে গাড়ি করে বের হয়ে যাচ্ছেন। একটি ছোট অসহায় পশুর প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টার মাঝে নিশ্চয়ই একটা মানবিক দিক রয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ অজ্ঞাত একটি কারণে তারিক কেন জানি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে।

জানালার কাছে তারিকের পাশে ইঞ্জিনিয়ার রিচার্ড এসে দাঁড়াল। বলল, তোমার দেশের ঘূর্ণিঝড়ের আর কিছু খবর পেলে?

তারিক চমকে উঠে বলল, ঘূর্ণিঝড়? কি ঘূর্ণিঝড়?

ও, তুমি জান না?

না। আমি এ. পি. এস. মীটিংয়ে সানডিয়াগো গিয়েছিলাম। গত তিন দিন কোনো খবর শুনি নি। কি হয়েছে?

খুব খারাপ একটা ঘূর্ণিঝড় হয়েছে শুনেছি। বেশ নাকি মানুষ মারা গিয়েছে।

কত মানুষ?

সি. এন. এনে তো বলল, তিন শ' হাজার। কিন্তু ভুল বলেছে নিশ্চয়ই। তিন শ' হাজার তো হতে পারে না। হতে পারে?

তারিক বিবর্ণ মুখে মাথা নেড়ে বলল, পারে।

হঠাৎ করে তার কেমন জানি বমি বমি লাগতে থাকে।

১১

গ্রে-হাউন্ড বাস স্টপ জায়গাটি ভালো নয়। চালচুলোহীন মানুষেরা এখানে এসে ভিড় জমায়। খবরের কাগজে মুড়ে বোতল থেকে সস্তা মদ খায়। একে অন্যের সঙ্গে মুখ খিস্তি করে। বাস স্টপের এক কোণায় মেঝেতে পা মুড়ে তিন জন মানুষ বসে আছে। একজন শ্বেতকায় মধ্যবয়সী মানুষ, মুখে নোংরা দাড়িগোঁফের জঙ্গল। দ্বিতীয় জন

একটি কালো মানুষ, মাথার কাছে দগদগে ঘা লাল হয়ে ফুলে আছে। তৃতীয় জন জামাল— খুব ভালো করে লক্ষ না করলে তাকে চেনা যায় না। গায়ের কাপড় ময়লা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখ রক্তবর্ণ, সেই চোখে একধরনের বোবা আতঙ্ক। একটা হাত সামনে রেখে সে একদৃষ্টে তার হাতের দিকে তাকিয়ে আছে। হাতের শিরা মোটা হয়ে ফুলে আছে। এই শিরার ভিতর দিয়ে কুলকুল করে রক্ত বইছে, সেই রক্তে হয়তো বংশবৃদ্ধি করছে এইচ. আই. ভি. ভাইরাস। ভয়ংকর এইচ. আই. ভি. ভাইরাস। জামালের শরীর শিউরে ওঠে থেকে থেকে।

জামাল একবার বাস স্টপের দিকে তাকাল। গ্রে-হাউন্ডের একজন কর্মচারী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তাদের দিকে। সম্ভবত আবার তাদের বের করে দেবে। তখন সে কোথায় যাবে কে জানে। শহরের মাঝামাঝি হতচ্ছাড়া ধরনের একটা পার্ক আছে, সেখানে সে যেতে পারে। খালি একটা বেঞ্চ পেলে শুয়ে থাকবে সেখানে। কিংবা কান্ট্রি ইন্টারস্টেট ব্যাংকের পার্কিং লটে যেতে পারে। মাটির নিচে অন্ধকার পার্কিং লটের এক কোণায় সে চুপচাপ বসে থাকতে পারে।

পরিচিত কারো সাথে দেখা হয়ে যাবে সেটাই তার ভয়। মাঝে মাঝে মনে হয় পরিচিত কেউ আসছে, তখন সে দুই হাঁটুর মাঝে মুখ গুঁজে বসে থাকে। লুকিয়ে থাকতে হবে তাকে, অন্ধকারে লুকিয়ে থাকতে হবে, মানুষের ভিড়ে লুকিয়ে থাকতে হবে মাথা নিচু করে। তাকে দেখলেই নিশ্চয়ই সবাই ছিটকে সরে যাবে ভয়ে। তার শরীরে নিশ্চয়ই আছে ভয়ংকর এইচ. আই. ভি.। এই শরীরটাকে ধ্বংস করে দিতে হবে সব ভাইরাসকে নিয়ে। কেমন করে করবে সে! সে তো ভীতু! সাহসী হলে এতদিনে লাফিয়ে পড়ত একটা বাইশচাকার ট্রাকের নিচে। সেটার সাহস নেই, তাই সে অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকে। প্রথম প্রথম কিছু একটা ভাবত, আজকাল আর কিছু ভাবে না। মাথার ভিতরে কেমন যেন এক ধরনের শূন্যতা। ছাড়া ছাড়া ভাবে মাঝে মাঝে কিছু-একটা মনে হয়, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই ভয়াবহ শূন্যতা।

তারিকের অফিসে ন্যান্সি এসেছে দেখা করতে। ফোন করে এসেছে, খুব নাকি জরুরি একটা ব্যাপার। মেয়েটিকে দেখেছিল জামালের সাথে, তেজস্ক্রিয় পদার্থের কথা যখন জানতে এসেছিল জামাল, তখন। তারিক ঠিক বুঝতে পারল না কী জরুরি ব্যাপার হতে পারে।

ন্যান্সি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, তোমার কাছে আমি একটা জিনিস জানতে এসেছি।

কি জিনিস?

তুমি কি জান জামালকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?

খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! কী বলছ তুমি!

হ্যাঁ।

কী হয়েছে?

কেউ ঠিক বলতে পারে না। ন্যান্সি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, হঠাৎ করে মাথা-খারাপের মতো হয়ে গেছে।

মাথা খারাপ? তারিক অবাক হয়ে বলল, মাথা খারাপ?

হ্যাঁ। কাজ ছেড়ে দিয়েছে। বাসায় ফিরে যায় না, রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায়।

জামাল?

হ্যাঁ, জামাল। ন্যান্সি মেয়েটির চোখ ছলছল করে ওঠে, তুমি কি দেখেছ তাকে?

না, দেখি নি। তারিক তখনো ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারে নি।

আমি যে ওকে কতদিন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি! কী হয়েছে ওর? কোথায় আছে? তুমি কিছু জান না?

না।

তুমি তো ওর বন্ধু। তুমি ওকে খুঁজে দেবে, প্লীজ? ওর কোনো-একটা খবর পেলে আমাকে জানাবে?

জানাব। নিশ্চয়ই জানাব।

আহা, আমার জামাল! না জানি কি কষ্টের মাঝে আছে!

ন্যান্সি হঠাৎ দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

তারিক কী বলবে বুঝতে পারে না। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, তুমি এত ঘাবড়ে যেও না ন্যান্সি। আমি খোঁজ নেব। খোঁজ নিয়ে তোমাকে জানাব।

জানাবে? সত্যি? প্লীজ!

হ্যাঁ। এখানে অনেক বাঙালি আছে, তাদের কেউ-না-কেউ নিশ্চয়ই এর খোঁজ জানে।

জানে? ন্যান্সি হঠাৎ উত্তেজনায় প্রায় লাফিয়ে উঠে ব্যাকুল হয়ে বলে, তুমি ফোন কর। প্লীজ তুমি ফোন কর। এক্ষুণি—

এক্ষুণি?

হ্যাঁ।

তারিক টেলিফোন নাম্বার বের করে ফরিদকে টেলিফোন করল। ফরিদ জামালের মাথা-খারাপ হওয়ার খবরটি বেশ ভালোভাবে জানে। তারিক যে এখনো জানে না, সেটা শুনে সে বেশ অবাকই হল। ফরিদ বলল, জামালকে মাঝে মাঝে নাকি রাস্তাঘাটে দেখা যায়। জামালের সবচেয়ে ভালো খোঁজ নাকি দিতে পারবে মণ্ডল নামের একজন ভদ্রলোক, তার বাসা আর জামালের অ্যাপার্টমেন্টটি বেশ কাছাকাছি। ফরিদ তারিককে মণ্ডল সাহেবের টেলিফোন নাম্বার দিল। তাঁকে বাসায় পাওয়া গেল না, তাঁর স্ত্রী অফিসের নাম্বার দিলেন। অফিসে ফোন করে সত্যি সত্যি জামালের খোঁজ পাওয়া গেল— সে নাকি বেশির ভাগ সময় গ্রে-হাউন্ড বাস স্টপে বসে থাকে। কাউকে চেনে না, কারো সাথে কথা বলে না, বদ্ধ পাগল। মণ্ডল সাহেব খবরটি দিতে গিয়ে আনন্দে হেসে ফেললেন।

ন্যান্সি সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল, তারিকের দু' হাত জাপটে ধরে বলল, তুমি যাবে আমার সাথে? প্লীজ! যাবে? তারিক, ও আমাকে দু' চোখে দেখতে পারে না।

তারিক অবাক হয়ে ন্যান্সির দিকে তাকিয়ে থাকে। এই হচ্ছে ভালবাসা? রমণীর ভালবাসা? যে-ভালবাসার জন্যে সে বুভুক্ষের মতো অপেক্ষা করে আছে আর জামাল দু' পায়ে দলে দিচ্ছে অবলীলায়।

জামাল।

কে ডাকছে তাকে? জামাল চোখ খুলে তাকাল না, কুঁকড়ে মাথা ঢেকে ফেলল হাঁটুর নিচে।

জামাল— আমি ন্যান্সি। এই দেখ।

জামাল তবু মাথা তুলল না। পূতিদুর্গন্ধময় নোংরা জায়গা, ন্যান্সি তার মাঝে হাঁটু গেড়ে বসে জামালকে জড়িয়ে ধরে বলল, জামাল আমার জামাল, তুমি চোখ খুলে দেখ একবার, চোখ খুলে দেখ।

জামাল পিটপিট করে তাকাল একবার। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইল ন্যান্সিকে, কিন্তু কতদিন থেকে সে অর্ধাহারে অনাহারে আছে, গায়ে জোর নেই বিন্দুমাত্র। ন্যান্সি তাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরল, নোংরা চোখ মুখ গালে মুখ ঘষে চুমু খেতে খেতে বলল, আমার জামাল, সোনামানিক আমার, ভালবাসার ধন, তুমি কেন এমন করছ? তুমি কেন এমন করছ?

জামাল নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বলল, আমাকে ছুঁয়ো না। চলে যাও— চলে যাও—

কেন সোনামানিক? কেন চলে যাব আমি?

সর্বনাশ হয়ে যাবে! চলে যাও।

কেন সর্বনাশ হবে? কী সর্বনাশ?

জামাল কোনো কথা না বলে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ন্যান্সি আবার তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, বল। কথা বল।

সানফ্রান্সিসকো থেকে আমাকে ফোন করেছে।

কে ফোন করেছে?

জানি না।

কেন ফোন করেছে?

বলেছে আমার রক্তে মনে হয় এইচ. আই. ভি. ভাইরাস আছে।

এইচ. আই. ভি.?

হ্যাঁ! বলেছে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে দেখতে।

দেখেছ?

না।

কেন?

ভয় করে। আমার খুব ভয় করে। জামাল হঠাৎ একটা শিশুর মতো কাঁদতে শুরু করে, কাঁদতে কাঁদতে ভাঙা গলায় বলে, আমার রক্তের মাঝে এইচ. আই. ভি.— আমাররক্তেরমাঝে—এইচ. আই. ভি.। আমার ভয়—প্রচণ্ড ভয়—

ন্যান্সি জামালকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলে, তোমার কোনো ভয় নেই সোনামানিক। কোন ভয় নেই। আমি আছি তোমার সাথে।

আমাকে ছুঁয়ো না। তোমারও এইডস হয়ে যাবে।

ন্যান্সি গভীর ভালবাসায় জামালকে বুকে চেপে ধরে বলে, হোক। তোমার যদি হয় আমারও হবে।

জামাল অবাক হকে ন্যান্সির দিকে তাকিয়ে থাকে। মস্তিষ্কে যে বিশাল শূন্যতা ছিল; সেটা যেন ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাচ্ছে। সেই শূন্যতা যেন পরিপূর্ণ হচ্ছে শৈশবের স্মৃতিতে, কৈশোরের স্মৃতিতে, যৌবনের স্মৃতিতে, ভালবাসার স্মৃতিতে। কতদিন সে ঘুমায় নি, হঠাৎ গভীর ঘুমে তার চোখ বুজে আসতে থাকে। ন্যান্সির কাঁধে মাথা রেখে জামাল চোখ বুজল।

ন্যান্সি মাথা ঘুরিয়ে তারিককে ডেকে বলল, একটা অ্যাম্বুলেন্স ডাকবে, প্লীজ? হাসপাতালে নিতে হবে জামালকে। এক্ষুণি।

১২

ফরিদ টেবিলে মাথা রেখে বসে আছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, ভিতরে কোথায় জানি একটা শিরা দপদপ করছে, মনে হচ্ছে যে-কোনো মুহূর্তে ফেটে যাবে আর নাক-মুখ দিয়ে উষ্ণ রক্ত গলগল করে বের হয়ে আসবে। তার ভাইয়ের যেরকম হয়েছিল। যে-দৃশ্যটা সে প্রায়ই দেখে।

তার পাঁচ ভাই দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে কেমন জানি বিহ্বল একটা দৃষ্টি! যেন বুঝতে পারছে না কী হবে। হাত চারেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে একজন পাকিস্তানি মিলিটারি জোয়ান। কমবয়সী একজন মানুষ। টকটকে গায়ের রং, মুখে একটা সিগারেট চেপে ধরা। হাতে কী চমৎকার একটা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল! কার সাথে যেন উচ্চস্বরে একটা কথা বলল, তারপর সিগারেট মুখে চেপে রেখেই কী আশ্চর্য সহজভাবে গুলি করে দিল। বড় ভাইয়ের মাথার একটা অংশ উড়ে গেল হঠাৎ করে। মেজো ভাই দুই হাত সামনে এগিয়ে দিল, যেন বুলেটগুলি থামানোর চেষ্টা করছে হাত দিয়ে।

ফরিদ টেবিলে মাথা ঠুকল কয়েক বার। অসহ্য যন্ত্রণা মাথায়, আহা, যদি কিছু-একটা করতে পারত সে! গলা শুকিয়ে গেছে, গ্লাসটা তুলে দেখে খালি। বাথরুমে গিয়ে ট্যাপ খুলে পানি ঢেলে ঢকঢক করে এক নিঃশ্বাসে খেয়ে নেয় সে, সাথে সাথে

কেমন জানি বমি বমি লাগতে থাকে তার।

ফরিদ আয়নায় নিজের দিকে তাকাল, চোখ দু'টি টকটকে লাল। ঠোঁটগুলি শুকনো, অনেকটা কালচে হয়ে আছে। চুলগুলি দুই হাতে এতবার টেনেছে যে, মাথার চুল এলোমেলো হয়ে আছে। ফরিদের নিজের কাছেই নিজের চেহারা কেমন জানি অচেনা মনে হয়। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে নিজের দিকে, আর কেমন জানি বিজাতীয় অসহ্য একটা ক্রোধ নিজের মাঝে পাক খেতে থাকে। মনে হয় নিজের টুঁটি নিজে চেপে ধরে মাথাটা দেয়ালের মাঝে ঠুকতে থাকে, যতক্ষণ-না সবকিছু থেঁতলে একটা অর্থহীন রক্তমাংসমজ্জাপিণ্ডে পাল্টে যায়। ফরিদ আয়না থেকে তার হিংস্র চোখ সরিয়ে নিয়ে টলতে টলতে বসার ঘরে এসে সোফায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। মনে হচ্ছে মাথাটা ছিঁড়ে দেহ থেকে ছিটকে আলাদা হয়ে পড়বে।

ভাসা ভাসা আবার একটা দৃশ্য ভেসে আসে চোখের সামনে। খাটের নিচে লুকিয়ে আছে ছোট ভাই কমল। পাকিস্তানি মিলিটারির একজন জোয়ান চুলের ঝুঁটি ধরে তাকে টেনে বের করে আনছে। কী অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে কমল ভাই, যেন তার বিশ্বাস হচ্ছে না পুরো ব্যাপারটা! গুলি করে যখন তাকে মেরে ফেলেছে, তখনও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে কমল ভাই। মানুষ মরে গেলে নাকি চোখ বন্ধ করে দিতে হয়। কেউ চোখ বন্ধ করে নি কমল ভাইয়ের, তাই মরে গিয়েও কমল ভাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ফরিদ যখন তাকাল কমল ভাইয়ের দিকে, দেখল স্থির বিচিত্র একটা দৃষ্টিতে কমল ভাই মরে গিয়েও তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ বন্ধ করে ফরিদ এখনও দেখতে পায় কমল ভাই অবাক হয়ে ফরিদের দিকে তাকিয়ে আছে, অবাক হয়ে, ভীষণ অবাক হয়ে—

ফরিদ নিজের চুল ধরে মাথা ঝাঁকায় কয়েক বার, ফিসফিস করে বলে, আর তো সহ্য হয় না খোদা—আর তো সহ্য হয় না— সহ্য হয় না— সহ্য হয় না—

সোফা থেকে উঠে বসে, পকেট হাতড়ে আরো দু'টি ট্যাবলেট বের করে। কোডিন দেয়া টাইলেনল। চার ঘন্টায় দু'টির বেশি খাওয়ার কথা নয়, সে ইতোমধ্যে চারটি খেয়েছে, আরো দু'টি খেয়ে দেখবে এখন।

মায়ের কথা মনে পড়ল হঠাৎ। পাঁচ ভাইয়ের পাঁচটি শরীর পাশাপাশি মেঝেতে শুয়ে আছে। শরীরের রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে। মা মাথার কাছে চুপ করে বসে আছেন। তাকিয়ে আছেন দেয়ালের দিকে। কিছু নেই সেই দেয়ালে, ধবধবে সাদা দেয়াল, একটা ছবিও নেই। মা অবাক হয়ে শূন্যদৃষ্টিতে সেই দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন। অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে তাঁর একটা ছেলের দিকে তাকান, কপাল থেকে চুল সরিয়ে দেন, শার্টের কলারটা সোজা করে দেন, তারপর আবার দেয়ালের দিকে তাকান। মুখে দুঃখের কোনো চিহ্ন নেই। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলেন, মনে হয় হঠাৎ করে শুকনো মরুভূমির উপর হা-হা করে জ্বলন্ত বাতাস ছুটে আসে পৃথিবীকে ছারখার করে দেবার জন্যে। ফরিদের মাথার ভিতর সেই ভয়ংকর সর্বনাশা দীর্ঘশ্বাস ঘুরপাক খেতে থাকে— ঘুরপাক খেতে থাকে। আহ্! কী যন্ত্রণা! কী কষ্ট!

ফরিদ উঠে দাঁড়ায়, জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। বাইরে অন্ধকার নেমেছে। গাড়ি যাচ্ছে শব্দ করে। পিছনের লাল বাতি দু'টি যেন একজন মানুষের ক্রুদ্ধ এক জোড়া চোখ, প্রচণ্ড আক্রোশে যেন তাকে বলছে, ধ্বংস হ! ধ্বংস হ!

ফরিদ থরথর করে কাঁপতে থাকে। তার আর কোনো উপায় নেই। তাকে বের হতে হবে। স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে এক্সেলেটরে চাপ দিয়ে সানসেট বুলোভার্ড দিয়ে বের হয়ে যেতে হবে ভারমন্টের উপর দিয়ে। ট্রাফিক লাইট তখন থাকবে লাল। উল্টোদিক দিয়ে তখন ছুটে আসবে গাড়ি। তার মাঝে দিয়ে সে বের হয়ে যাবে ষাট-সত্তুর-আশি মাইল স্পীডে। দুই পাশে থাকবে উজ্জ্বল শহর, ঝকঝকে নিয়নবাতি, মানুষের ভিড়, রঙিন গাড়ি— তার মাঝে ছুটে যাবে সে গুলির মতো। সবকিছু ঝাপসা হয়ে যাবে চারপাশে। শুধু একটা লাল বিন্দুর মতো ট্রাফিক লাইট জ্বলজ্বল করতে থাকবে সামনে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে ছুটে যাবে সে। তীক্ষ্ণ হর্নে কান ঝালাপালা হয়ে যাবে, প্রচণ্ড শব্দে ব্রেক করবে, তাল হারানো গাড়ি, টায়ার পোড়া ধোঁয়ায় ঢেকে যাবে চারদিক, ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে যাবে আর তার মাঝে দিয়ে ছুটে বের হয়ে যাবে সে। হয়তো বের হয়ে যাবে, হয়তো যাবে না। হয়তো প্রচণ্ড আঘাতে গাড়ি ছিটকে পড়বে এক পাশে। বিস্ফোরণে ফেটে যাবে গ্যাসট্যাংক, দাউদাউ করে জ্বলে উঠবে গাড়ি.......

ফরিদ থরথর করে কাঁপতে থাকে। প্রচণ্ড জ্বরে বিকারগ্রস্ত মানুষের মতো সে হাতড়ে হাতড়ে নিচে নামতে থাকে। কোনো কিছু নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার আর ক্ষমতা নেই ফরিদের। মাথার মাঝে শুধু একটি জিনিস। ট্রাফিকের লাল সিগনাল জ্বলজ্বল করে জ্বলছে আর এক্সেলেটরে চাপ দিয়ে সে গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে তুলছে ষাট থেকে সত্তুরে, সত্তুর থেকে আশি, আশি থেকে নব্বই—

সানসেট বুলোভার্ড দিয়ে গাড়ি ছুটে যেতে থাকে। এক্সেলেটরে চাপ দেয় ফরিদ। গাড়ির গতিবেগ বাড়তে থাকে। ষাট থেকে সত্তুর। সত্তুর থেকে আশি। ছায়ার মতো সরে যাচ্ছে সবকিছু। সামনে শুধু লাল বিন্দুর মতো ট্রাফিক লাইট। দুই পাশ থেকে ঝড়ের মতো ছুটে যাচ্ছে গাড়ি, তার মাঝে দিয়ে বের হয়ে যাবে সে। প্রচণ্ড হর্ন শুনতে পায় ফরিদ। গাড়িগুলি সরে যেতে চেষ্টা করছে। তাল হারিয়ে ছিটকে পড়ছে দু' পাশে। পুলিশের সাইরেন তীক্ষ্ণ স্বরে বেজে ওঠে হঠাৎ। তীব্র আলোর ঝলকানি চোখ ধাঁধিয়ে দিল, প্রচণ্ড শব্দ—কান-ফাটানো বিস্ফোরণ।

প্রচণ্ড আঘাতে সমস্ত পৃথিবী দুলে উঠল হঠাৎ।

অনেকক্ষণ থেকে টেলিফোনটা বেজে যাচ্ছে। টেলিফোনটা রাতে মাথার কাছে রাখা হয় নি। তারিক আধঘুমে উঠে হাতড়ে হাতড়ে টেলিফোনটা ধরল। এত রাতে কে টেলিফোন করেছে?

হ্যালো।

আমি হলিউড পুলিশ স্টেশন থেকে বলছি।

তারিকের ঘুম চটে গেল সাথে সাথে। বলল, কেন, কী হয়েছে?

তুমি কি তারিক?

হ্যাঁ।

তুমি কি ফরিদ নামে কাউকে চেন?

চিনি। কেন, কী হয়েছে?

পুলিশ উত্তর দেবার আগেই হঠাৎ তারিক বুঝে গেল কী হয়েছে। খুব সাবধানে সে দেওয়ালটা ধরে আস্তে আস্তে মেঝের উপর বসে।

ফরিদ! এটা তুমি কী করলে ফরিদ!

দেশের মসজিদে মেয়েরা আসে না, এখানে আসে। পিছন দিকে খানিকটা জায়গা মেয়েদের জন্যে আলাদা করে রাখা আছে।

অনেক মেয়ে এসেছে। শাড়ি পেঁচিয়ে মাথা ঢেকে রেখেছে বলে দেখতে তাদের কেমন জানি অন্যরকম লাগছে আজ। পরিচিত অপরিচিত প্রায় সবাই এসেছে। জামালও এসেছে ন্যান্সিকে নিয়ে। ন্যান্সি একটা কালো শাড়ি পরে এসেছে। শোকের প্রতীক কালো পোশাকে যে একজন মানুষকে এত সুন্দর দেখাতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

তারিক একটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেছে। তার এক পাশে আমজাদ সাহেব, অন্য পাশে একজন অপরিচিত মানুষ। সামনে মসজিদের মাঝামাঝি এক জায়গায় ফরিদের মৃতদেহ সাদা কাপড়ে ঢাকা। তার জানাজার ব্যবস্থা চলছে। আশরাফ ব্যস্ত হয়ে হাঁটাহাঁটি করছে, কথা বলছে, মৃত্যুর পরও কিছুই থেমে থাকে না।

মিলিকে দেখা গেল হঠাৎ। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে, চোখ দুটি লাল, মনে হয় কেঁদেছে খানিকক্ষণ। মিলি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে এক কোণায়, হঠাৎ পেশীবহুল একজন মানুষ এগিয়ে গেল মিলির দিকে, ইংরেজিতে বলল, সিস্টার, মাথায় কাপড় দাও।

মিলি হকচকিয়ে গিয়ে মাথায় কাপড় তুলে দিল।

মানুষটি আবার বলল, মুসলমান মেয়েদের মাথা ঢেকে রাখতে হয়।

জানাজা পড়ার জন্যে সবাই সারি বেধে দাঁড়িয়েছে। তারিকও উঠে দাঁড়াল, শেষের দিকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষগুলিকে লক্ষ করতে থাকে, এখানে বাঙালি ছাড়া অন্য দেশের মানুষও আছে। কিছু মধ্যপ্রাচ্যের, কিছু ভারতবর্ষের— মনে হল কিছু পাকিস্তানেরও আছে। পাকিস্তানের? তারিক ভুরু কুঁচকে পাশে দাঁড়ানো মানুষটিকে জিজ্ঞেস করল, এখানকার অবাঙালি মানুষগুলি কোন দেশি?

পাকিস্তানি। বেশির ভাগ পাকিস্তানি।

পাকিস্তানি?

জ্বি। ইমাম সাহেবও পাকিস্তানি। বুজুর্গ মানুষ।

তারিক হঠাৎ ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে যায়। ফরিদের জানাজায় পাকিস্তানি মানুষ— এটা তো হতে পারে না।

লোকজন সারি বেধে দাঁড়িয়ে গেছে। পাকিস্তানি ইমাম সাহেব জানাজা পড়ানোর জন্যে নিয়ত প্রায় বেঁধে ফেলেছেন, তারিক হাত তুলে তাঁকে থামাল। উপস্থিত সবার দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বলল, জানাজা শুরু করার আগে আমার একটি খুব জরুরি কথা বলতে হবে। খুব জরুরি।

কী বলবে শোনার জন্যে সবাই কৌতূহলী চোখে তাকায়। তারিক গলা উঁচু করে বলল, একাত্তর সালে পাকিস্তানি মিলিটারিরা ফরিদের পাঁচ ভাইকে একসাথে গুলি করে মেরেছিল। পাঁচ ভাইকে। একসাথে।

উপস্থিত অনেকে, বিশেষ করে যারা পাকিস্তানের, তারা ভুরু কুঁচকে তাকাল। তারিক বলল, ফরিদ সেজন্যে কখনো পাকিস্তানের মানুষকে ক্ষমা করে নি। ফরিদ পাকিস্তানের মানুষকে এত ঘেন্না করত যে এদেশে কখনো ঈদের জামাতে নামাজ পর্যন্ত পড়তে যায় নি। কারণ তা হলে হয়তো পাকিস্তানির সাথে কোলাকুলি করতে হবে।

উপস্থিত বেশ কিছু মানুষ হঠাৎ করে খুব ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। কেউ কেউ প্রতিবাদ করে কিছু–একটা বলতে চাইছিল, তারিক গলা উঁচিয়ে বলল, আমি ফরিদের জানাজায় কোনো পাকিস্তানিকে দাঁড়াতে দেব না। যারা পাকিস্তানি, তারা অনুগ্রহ করে সরে যান।

উপস্থিত সবাই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারিক আবার গলা উঁচিয়ে বলল, পাকিস্তানিরা সরে যান।

পেশীবহুল মানুষটি, যে একটু আগে মিলিকে মাথায় কাপড় দেয়ার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল, সে পাকিস্তানি মানুষের বিশেষ ইংরেজি উচ্চারণে বলল, এটা খোদার ঘর। এখানে পাকিস্তানি বোংলাদেশ নাই। সবাই ভাই ভাই—

তারিক বলল, শব্দটা বোংলাদেশ না, বাংলাদেশ। আর তোমার কাছে হয়তো পাকিস্তান বাংলাদেশ নেই, কিন্তু যার জানাজা পড়ানোর জন্যে এখানে এসেছ, তার কাছে ছিল। পাঁচ ভাইকে তার চোখের সামনে পাকিস্তানিরা গুলি করে মেরেছিল। পাঁচ ভাইকে। সেই থেকে তার মাথার মাঝে একটু গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। সে মারা গেছে এ জন্যেই। পাকিস্তানিরা তার পাঁচ ভাইকে মারে নি, ছয় ভাইকে মেরেছে। ছয় ভাইকে।

ব্রাদার। আল্লাহ্‌র ঘরে পলিটিক্স হয় না।

মানুষ মারা পলিটিক্স না, মানুষ মারা মার্ডার। সেটা নিয়ে আমি তোমার সাথে আলোচনা করতে চাই না। তুমি যদি পাকিস্তানি হও, সরে যাও। আমি এখন তোমার সাথে তর্ক করতে চাই না।

তোমার হুকুম?

হ্যাঁ, আমার হুকুম। এই ডেডবডি পুলিশের কাছ থেকে আমি বুঝে নিয়েছি। এর দায়–দায়িত্ব আমার। আমি বলছি পাকিস্তানিরা সরে যাও। যদি তোমরা না সর, এই

www.banglabook.com

ডেডবডি আমি সরিয়ে নিয়ে যাব। দরকার হলে আমি আমার বাড়ি নিয়ে জানাজা পড়াব, কিন্তু কোনো পাকিস্তানিকে আমি তার জানাজায় থাকতে দেব না। এই মানুষটির জীবন তোমরা শেষ করেছ, শেষ সময়ে তার আত্মাকে কষ্ট দিও না।

তারিক ফরিদের মৃতদেহকে সামনে নিয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে বলল, সব পাকিস্তানি সরে যাও।

ধীরে ধীরে জানাজায় দাঁড়ানো মানুষজনের মাঝে থেকে বেশ কিছু মানুষ মাথা নিচু করে বের হয়ে গেল।

ফরিদের জানাজা পড়ালেন আমজাদ সাহেব।

১৩

চতুষ্কোণ ছোট কার্ডটি দরজায় প্রবেশ করাতেই খুট করে ছিটকিনি খুলে গেল। তারিক ভিতরে ঢুকে হাতের ছোট ব্যাগটি চেয়ারের উপর রেখে জানালার দিকে এগিয়ে যায়। পর্দা টেনে দিতেই সে মুগ্ধ হয়ে গেল, কী সুন্দর বাইরে! নীল হ্রদ, হ্রদের তীরে সারি সারি সেলবোট, দূরে হালকা নীল রংয়ের পাহাড়ের ছায়া— অপূর্ব একটা দৃশ্য! ক্যালেন্ডারেই শুধু এরকম দৃশ্য দেখা যায়। কাল রাতে যখন হোটেলে এসেছিল, তখন বাইরে অন্ধকার নেমে গেছে। ভোরে যখন গ্লেন লিভিংস্টোন তাকে নিয়ে বের হয়ে গেছে, তখনো আলো ফোটে নি। বিকেলের পড়ন্ত আলোতে প্রথম বার এই অসাধারণ দৃশ্যটি দেখে সে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

গ্লেন লিভিংস্টোনের আমন্ত্রণে সে দু'দিনের জন্যে এই এলাকায় এসেছে। আজকের দিনটি কাজকর্মে কেটেছে, কাল কোনো কাজ নেই, গ্লেন তাকে এই এলাকাটি ঘুরিয়ে দেখাবে। তারা খুব চাইছে তারিক এখানে যোগ দেয়, তাকে মুগ্ধ করানোর জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করা হচ্ছে। তাকে রাখার জন্য এই হোটেলটি বেছে নেয়াও হয়তো তাকে মুগ্ধ করানোর একটা সুক্ষ্ম প্রচেষ্টা।

তারিক গলা থেকে টাইটা খুলতে খুলতে ভিতরে তাকাল। বিশাল বিছানাটি গুছিয়ে দিয়ে গেছে, টেবিলে ছড়ানো-ছিটানো কাগজে হাত দেয় নি, কিন্তু অন্য সব কিছু তকতকে ঝকঝকে। বড় হোটেলের সবকিছুতেই কেমন যেন ঐশ্বর্যের চিহ্ন। তারিক রিমোট কন্ট্রোলটি দিয়ে টেলিভিশনটি চালিয়ে দিয়ে গদিআঁটা নরম চেয়ারটিতে আরাম করে বসে। গাড়ির একটা বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছে, তার নিজের বাসায় ছোট সস্তা টেলিভিশনটিতে এই বিজ্ঞাপনটি কী কুৎসিতই না দেখায়! গাড়ির রংটি দেখায় ক্যাটক্যাটে বেগুনি অথচ এখানে চোখ জুড়ানো একটা মেরুন রং। তারিক মুগ্ধ হয়ে দেখল। গাড়ির বিজ্ঞাপনের পর হল কর্ন ফ্লেক্সের বিজ্ঞাপন। যে-মানুষটি কর্ন ফ্লেক্স খাচ্ছে তাকে তার টেলিভিশনে একটা নির্বোধের মতো মনে হয়, অথচ এখানে দেখাচ্ছে রীতিমতো একজন ভদ্রলোক। ব্যাপারটি কেমন করে হয় কে জানে!

তারিক খানিকক্ষণ টেলিভিশনের সামনে বসে থেকে উঠে দাঁড়াল। আজ রাতে আর কোনো কাজ নেই। গোসল, খাওয়া সেরে বিছানায় আধশোয়া হয়ে একটা ভালো বই

নিয়ে বসে থাকবে বিলাসী মানুষের মতো।

ঝকঝকে বাথরুমে দীর্ঘ সময় উষ্ণ পানিতে গোসল করে ধবধবে সাদা টাওয়েল জড়িয়ে তারিক বের হয়ে আসে। এর মাঝে বেশ খিদে লেগে গেছে। লস এঞ্জেলস সময় অনুযায়ী এখন অপরাহ্ন, খিদে লাগার কথা নয়। কিন্তু সারাদিনের ব্যস্ততার পর গোসল করে সতেজ হয়ে নেয়ার সাথে সাথে শরীরটি একপেট খাবারের জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেছে বলে মনে হল।

ঘরের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে তারিক নির্মমভাবে নিজের চুল মুছতে মুছতে টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে থাকে। টেলিভিশনে একটি সূর্যাস্ত দেখানো হচ্ছে। গলা কাঁপিয়ে প্রতিবেদক বলছে, এটা হচ্ছে বছরের শেষ সূর্যাস্ত, কাল যখন নূতন সূর্য উঠবে, সেই সূর্য বয়ে আনবে একটি নূতন বছর। তারিকের হঠাৎ মনে পড়ল আজ বছরের শেষ দিন, ডিসেম্বরের ৩১ তারিখ।

কাপড় পরতে পরতে আবার টেলিভিশনের সামনে দাঁড়ায় তারিক। বছরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি দিয়ে একটি ছোট অনুষ্ঠান করেছে, নাম দিয়েছে ভিডিও মন্তাজ। একটির পর একটি দৃশ্য দেখিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। প্রথমে দেখাল বিজয়ের দৃশ্য, শত্রুর উপর বিজয়, রোগ শোক জরা ব্যাধির উপর বিজয়। তারপর দেখাল রাজনৈতিক ঘটনাবলী, সবার শেষে মানুষের দুঃখকষ্টের দৃশ্য। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দৃশ্য। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষকে দেখাল, তুরস্কের ভূমিকম্পে হতাহতদের দেখাল, গৃহহীন কুর্দি মানুষকে প্রাণভয়ে ছুটে যেতে দেখাল, আফ্রিকার অনাহারী মানুষদেরদেখাল—

তারিক হঠাৎ নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলে। এখন নিশ্চয়ই দেখাবে বাংলাদেশের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়, প্রলয়ঙ্করি জলোচ্ছ্বাস। নিশ্চয়ই দেখাবে সেই ভয়ংকর দৃশ্যটি, যেখানে সমুদ্রের উপকূলে সারি সারি পড়ে আছে মানুষ আর পশু— মৃত্যু যেখানে মানুষ আর পশুকে নিয়ে এসেছে একসারিতে। সেটি দেখানোর সময় নিশ্চয়ই আবার সবাইকে মনে করিয়ে দেবে, এই দেশ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ, এই দেশে মানুষের কোনো আশা নেই, কোনো ভবিষ্যৎ নেই। তারিক সারা শরীর শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকে টেলিভিশনের সামনে।

কিন্তু সেটি দেখাল না, ভিডিও মন্তাজ শেষ করে পারফিউমের একটি বিজ্ঞাপন দেখানো শুরু হয়ে গেল।

তারিক পিছিয়ে এসে বিছানায় বসে। বাংলাদেশে একরাতে তিন লক্ষ মানুষের মরে যাওয়াটি পৃথিবীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনার একটি নয়! তিন লক্ষ মানুষ! তিন লক্ষ মানুষ!

তারিকের মাথার মাঝে অন্ধ রাগ ফুঁসে উঠতে থাকে। ভয়ংকর অন্ধ রাগ। সে হাত বাড়িয়ে টেলিফোনটা তুলে নেয়, তাকে বের করতে হবে কেমন করে এটা ঘটতে পারে! টেলিফোন ডায়াল করার সময় সে লক্ষ করে তার হাত অল্প অল্প কাঁপছে।

ভোরবেলা গ্লেন লিভিংস্টোন এসে হাজির। আজ বছরের প্রথম দিন। সবকিছু ছুটি।

তারিকের সাথে সেভাবেই পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই ছুটির দিনে তারিককে এই এলাকাটি ঘুরিয়ে দেখাবে। নিউ ইয়র্ক স্টেটের এই উত্তরাঞ্চল এলাকাটি অপূর্ব সুন্দর, গ্লেনের খুব উৎসাহ সে কারণে।

তারিক গ্লেনকে বলল, গ্লেন, আমাদের পরিকল্পনা একটু পরিবর্তন করতে হবে।

কি পরিবর্তন?

আমাকে একটু নিউ ইয়র্ক শহরে যেতে হবে।

গ্লেন চোখ কপালে তুলে বলল, নিউ ইয়র্ক শহরে?

হ্যাঁ।

সেখানে কোথায়?

তারিক একটু ইতস্তত করে বলল, এ. বি. সি. টেলিভিশন স্টেশনে।

টেলিভিশন স্টেশনে? শো বিজনেসে নেমে যাচ্ছ নাকি?

তারিক একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, একজন মানুষের সাথে দেখা করতে হবে।

হঠাৎ করে?

হ্যাঁ, হঠাৎ করে। কাল রাতে একটা ব্যাপার হল, তারপর। হঠাৎ করেই হল। একজন প্রডিউসারের সাথে দেখা করতে হবে। বেলা একটায় সময় দিয়েছে। আমাকে দেখা করতেই হবে।

তাহলে এই এলাকাটা তুমি দেখার সময় পাবে না?

না। আমি দুঃখিত গ্লেন।

গ্লেন লিভিংস্টোনের একটু আশাভঙ্গ হল। সে ভেবেছিল তারিককে এই এলাকাটি দেখিয়ে মুগ্ধ করে দেবে। নিউ ইয়র্ক শহরে গিয়ে ফিরে আসতে আসতে চোখ বুজে সারাটি দিন চলে যাবে।

তারিক বলল, নূতন জায়গা, আগে কখনো যাই নি। তা ছাড়া ম্যানহাটানের যে গল্প শুনি, আমি একটু সময় নিয়ে যেতে চাই। একটা গাড়ি ভাড়া করতে হবে। তুমি আমাকে কাছাকাছি একটা কার রেন্টাল অফিসে নামিয়ে দাও।

গ্লেন বলল, তা দিচ্ছি। আজ অবশ্যি ছুটির দিন, রাস্তাঘাটের অবস্থা এত খারাপ হবে না। ছুটির দিনে তোমার সেই প্রডিউসার থাকবে তো?

বলেছে থাকবে।

গ্লেন একটু ভেবে বলল, এক কাজ করা যাক।

কি?

আমি তোমাকে ম্যানহাটান নিয়ে যাই। আমি রাস্তাঘাট চিনি, অনেকবার গিয়েছি। তোমাকে চট করে নিয়ে যেতে পারব।

তুমি কেন কষ্ট করে—

কষ্ট কী বলছ! আমার নিজের স্বার্থ। আমি চাই তুমি আমাদের কোম্পানিতে জয়েন কর। সেজন্যে আমি তোমাকে এখানকার সব ভালো ভালো জায়গা, ভালো ভালো জিনিস দেখিয়ে দিতে চাই। তা ছাড়া—

তা ছাড়া কি?

ম্যানহাটানে তুমি নিজে যদি গাড়ি চালিয়ে যাও, তোমার এমন একটা ভয়ংকর অভিজ্ঞতা হবে যে এই জন্মে তুমি আর এই এলাকায় ফিরে আসবে না!

তারিক শব্দ করে হাসল। গ্লেন মানুষটি বেশ!

গ্লেন তারিককে নিয়ে বেশ খানিকটা ঘুরে ম্যানহাটানে এল। তাদের কোম্পানিতে জয়েন করলে সে কোন এলাকায় থাকবে, কোন এলাকায় বাজারপাতি করবে, আনন্দ বিনোদনের জন্যে কোথায় বেড়াবে, এর মাঝেই তাকে মোটামুটি একটা ধারণা দিয়ে দিল। যেসব এলাকায় তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, সেগুলি সবই একেবারে ছবির মতো সুন্দর। দেখে লোভ লেগে যায়। তারিকের বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিটি অস্থায়ী। সেখানে কয়েক বছর হয়ে গেল। এখন স্থায়ী একটা চাকরি নেবার সময়। কোম্পানির এই চাকরিটি তার জন্যে চমৎকার হয়। একেবারে গোড়া থেকে নূতন একটা গ্রুপ করে তুলবে নিজের ইচ্ছেমতো। অনেক টাকা বেতন দেবে, হ্রদের তীরে ছোট একটা বাড়ি কিনতে পারবে সে। ছুটির দিনে ঘুম থেকে উঠে বাইরে বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসবে একটা বই নিয়ে।

তারা যখন ম্যানহাটান পৌঁছেছে, তখনো দুপুরের খাবারটা সেরে নেবার মতো খানিকটা সময় রয়ে গেছে। গ্লেন তারিককে খুব ভালো একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেল লাঞ্চের জন্যে।

এ. বি. সি. টেলিভিশনের বিল্ডিংটি খুঁজে বের করে লিফট দিয়ে উঠে এল দু' জন। ছুটির দিন, কিন্তু লোকজন বেশ আছে। বাইরের দিকে স্বর্ণকেশী সুন্দরী একজন রিসেপশনিস্ট বসে আছে। টেলিফোনটা কানে চেপে ধরে রেখেই তারিক আর গ্লেনের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হেসে বলল, তোমাদের সাহায্য করতে পারি?

হ্যাঁ। আমি ডেভিড বোম্যালের সাথে দেখা করতে এসেছি।

ডেভিড? ডেভিড হচ্ছে এগার নম্বর রুমে। সোজা গিয়ে ডান দিকে। খুব ব্যস্ত। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এসেছ?

হ্যাঁ। একটার সময় দেখা করার কথা।

তারিক আর গ্লেন হেঁটে হেঁটে ভিতরে আসে। লোকজন মাথা নিচু করে কাজ করে যাচ্ছে, যেদিকেই চোখ যায় বড় বড় কম্পিউটার মনিটর। ডেভিড বোম্যানের ঘর খুঁজে দেখা গেল ভিতরে কেউ নেই। তারিক বাইরে আরেকজনকে জিজ্ঞেস করতেই মধ্যবয়স্ক একজন মানুষকে দেখিয়ে দিল। একটা বড় কম্পিউটার মনিটরের সামনে দাঁড়িয়ে আরেকজনের সাথে কথা বলছে।

তারিক এগিয়ে গিয়ে বলল, তুমি কি ডেভিড বোম্যাল?

লোকটি ঘুরে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ।

আমি তারিক। তোমার সাথে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলাম একটার সময়।

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু একটা ঝামেলা হয়ে গেছে, টেলিভিশনের ব্যাপার, বুঝতেই পার। তোমার সাথে আজ বিকেলে কি কথা বলতে পারি? এই মনে কর চারটের দিকে? তখন সময় দিতে পারব।

আমি অনেক দূর থেকে এসেছি। আবার ফিরে যেতে হবে। আমার বেশি সময় লাগবে না। একটা প্রশ্ন করব শুধু। উত্তর দিতে তোমার এক মিনিটও লাগবে না।

বেশ। কী প্রশ্ন?

তারিক এক মুহূর্ত দ্বিধা করল। চারিদিকে এত মানুষজন, পিছনে গ্লেন দাঁড়িয়ে, তার মাঝে সবাইকে শুনিয়ে সে প্রশ্নটা করবে? সংকোচ ঝেড়ে ফেলল সে, বলল, গতকাল সন্ধেবেলা তোমরা সারা বছরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি দেখিয়েছ মিনিট দুয়েকের একটা প্রোগ্রামের মাঝে—

হ্যাঁ, ভিডিও মন্তাজ।

তুমি তার দায়িত্বে ছিলে?

হ্যাঁ।

কোন ঘটনাগুলি দেখানো হবে সেটা তুমি ঠিক করেছ?

হ্যাঁ।

বিপর্যয়ের অংশে এসে তুমি কুর্দি মানুষদের দুঃখের ছবি দেখিয়েছ, তুরস্কে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের দেখিয়েছ, সাউথ আফ্রিকার খুনোখুনি দেখিয়েছ, লেবাননে বোমা বিস্ফোরণে মানুষের মৃত্যু দেখিয়েছ, কুয়েতের হত্যাকাণ্ড দেখিয়েছ, কিন্তু বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড় আর জলোচ্ছ্বাস দেখাও নি। সেই ঘূর্ণিঝড়ে তিন লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল—

ডেভিড বোম্যাল বলল, মিষ্টার তারিক, তোমার সাথে কি আমি অফিসের ভিতর কথা বলতে পারি?

তারিক মাথা নাড়ল, না, আমি এখানে শুরু করেছি, এখানেই শেষ করতে চাই। আমার প্রশ্নটি খুব সহজ। ঠিক কী কারণে তুমি মনে কর ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশের তিন লক্ষ মানুষের মরে যাওয়াটি পৃথিবীর ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়?

ডেভিড বোম্যাল একটু হকচকিয়ে গেল, কী–একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল হঠাৎ, একটু অবাক হয়ে তারিকের দিকে তাকাল, যেন প্রথম বার তাকে দেখছে। তারিক মুখ শক্ত করে বলল, আমার প্রশ্নটি খুব সহজ মিষ্টার বোম্যাল। ভূমিকম্পে তুরস্কের কয়েক শ' মানুষ মারা যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, সাদ্দাম হোসেনের বোমায় হাজারখানেক কুর্দির মৃত্যু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কুয়েতে শ'খানেক মানুষের মৃত্যু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কিন্তু বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ে তিন শ' হাজার মৃত্যু গুরুত্বপূর্ণ নয় কেন? কেন?

তারিকের গলার স্বর উঁচু হয়ে গিয়েছে, নিজেকে সে আর ভদ্রতার খোলস দিয়ে আটকে রাখতে পারছে না। ইচ্ছে করছে এই মানুষটার টুঁটি চেপে দেয়ালের সাথে চেপে ধরে। কাঁপতে কাঁপতে সে প্রায় চিৎকার করে বলল, বল, কেন বাংলাদেশের তিন শ' হাজার মানুষের মৃত্যু একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়?

ডেভিড বোম্যাল স্থির দৃষ্টিতে তারিকের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, তুমি তো জান, কেন সেটা উল্লেখযোগ্য নয়।

না, আমি জানি না। তুমি বল—

পৃথিবীর হিসাবে বাংলাদেশের মানুষকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা যায় না মিষ্টার তারেক। তাই বাংলাদেশের তিন শ' হাজার মানুষ মরে গেল কি বেঁচে গেল সেটা নিয়ে পৃথিবীর কারো কোনো কৌতূহল নেই—

তারিক ভয়ংকর দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ ডেভিড বোম্যালের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে বলল, আমার সাথে সত্যি কথা বলার জন্যে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

তারিক ঘুরে দাঁড়াল, গ্লেন পিছনে ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। একটু এগিয়ে এসে তারিকের কাঁধ স্পর্শ করে বলল, নিশ্চয়ই কোথাও কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। এটা তো হতে পারে না, কিছুতেই হতে পারে না! আর কারো সাথে কথা বলা দরকার—

তারিক বাধা দিয়ে বলল, চল আমরা যাই।

কিন্তু—

তারিক অনুনয় করে বলল, প্লীজ—

গ্লেন খানিকক্ষণ তারিকের চোখের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে বলল, আমি আমার দেশের পক্ষ থেকে তোমার কাছে ক্ষমা চাই তারিক। তোমার দেশের কাছে ক্ষমা চাই।

তারিক উত্তর না দিয়ে হাঁটতে থাকে। এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

নীল হ্রদের পাশে দিয়ে গাড়ি ছুটে চলছে। হ্রদের তীরে তীরে উজ্জ্বল রংয়ের বাসা, দূর থেকে মনে হয় পুতুলের ঘরবাড়ি। তারিক অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল, গ্লেন।

কি?

আমি মনেহয় তোমাদের কোম্পানিতে জয়েন করতে পারব না।

কেন?

আমি ফিরে যেতে চাই।

কোথায়?

দেশে।বাংলাদেশে।

গ্লেন দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, তুমি যেটা করতে চাও সেটাই তুমি কর। তবে আমার শুধু একটা অনুরোধ, তুমি এখন কোনো সিদ্ধান্ত নিও না। লস এঞ্জেলসে ফিরে যাও। সপ্তাহখানেক সময় যেতে দাও—তারপর।

বেশ।

আরো খানিকক্ষণ পরে গ্লেন জিজ্ঞেস করল, তোমার দেশে কি তোমার কোনো চাকরি আছে?

না, নেই। তারিক হঠাৎ হেসে উঠে বলল, ভুল বললাম। একটা চাকরি আছে।

কী চাকরি?

নীল গাঙ নামে একটা নদী আছে, তার তীরে একটা গ্রাম— সেই গ্রামের নাম নীলাঞ্জনা। সেই গ্রামে গোলাম মুস্তফা সরকার নামে একজন শিক্ষক আছেন। তাঁর একটা স্কুল আছে, সেই স্কুলের নাম গণমুক্তি। গোলাম মুস্তফা সরকার সেই স্কুলে আমাকে একটা চাকরি দিয়ে গেছেন। তাঁর স্কুলে বিজ্ঞান পড়ানো। থাকা খাওয়া ফ্রী। বেতন কত শুনবে?

কত?

থাক্, শুনে কাজ নেই। তুমি হাসতে হাসতে পেট ফেটে মরে যাবে!

গ্লেন চোখের কোণা দিয়ে তারিককে দেখে বলল, তুমি—তুমি ঠাট্টা করে বলছ, তাই না?

ঠাট্টা? তারিক শব্দ করে হেসে বলল, হ্যাঁ, মনে হয় ঠাট্টাই করছি।

গ্লেন আস্তে আস্তে বলল, তুমি এখন কোনো সিদ্ধান্ত নিও না। প্লীজ! মানুষের জীবন কিন্তু একটাই। সেটা একবার ভুল হয়ে গেলে কিন্তু আবার গোড়া থেকে শুরু করা যায় না।

হ্যাঁ, জানি।

দু'জন চুপ করে বসে রইল। গাড়ি হ্রদের পাশ দিয়ে ছুটে যেতে থাকে।

১৪

তারিক জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে আকাশ সাদা ও ধোঁয়াটে। নিঃশব্দে তুষার পড়ছে। ধীরে ধীরে ঢেকে যাচ্ছে চারদিক। ঘরবাড়ি গাছপালা বন প্রান্তর আর আলাদা করে চেনা যায় না। বরফের সাদা চাদরের নিচে সব এক হয়ে মিশে গেছে। তারিক একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

এই দিকে বহু দূরে সে তার দেশকে ফেলে এসেছে।

For More Books of Humayun Ahamed &
Md. Zafar Iqbal Please Contact at:

RONY
shaibalrony@yahoo.com
01914882384